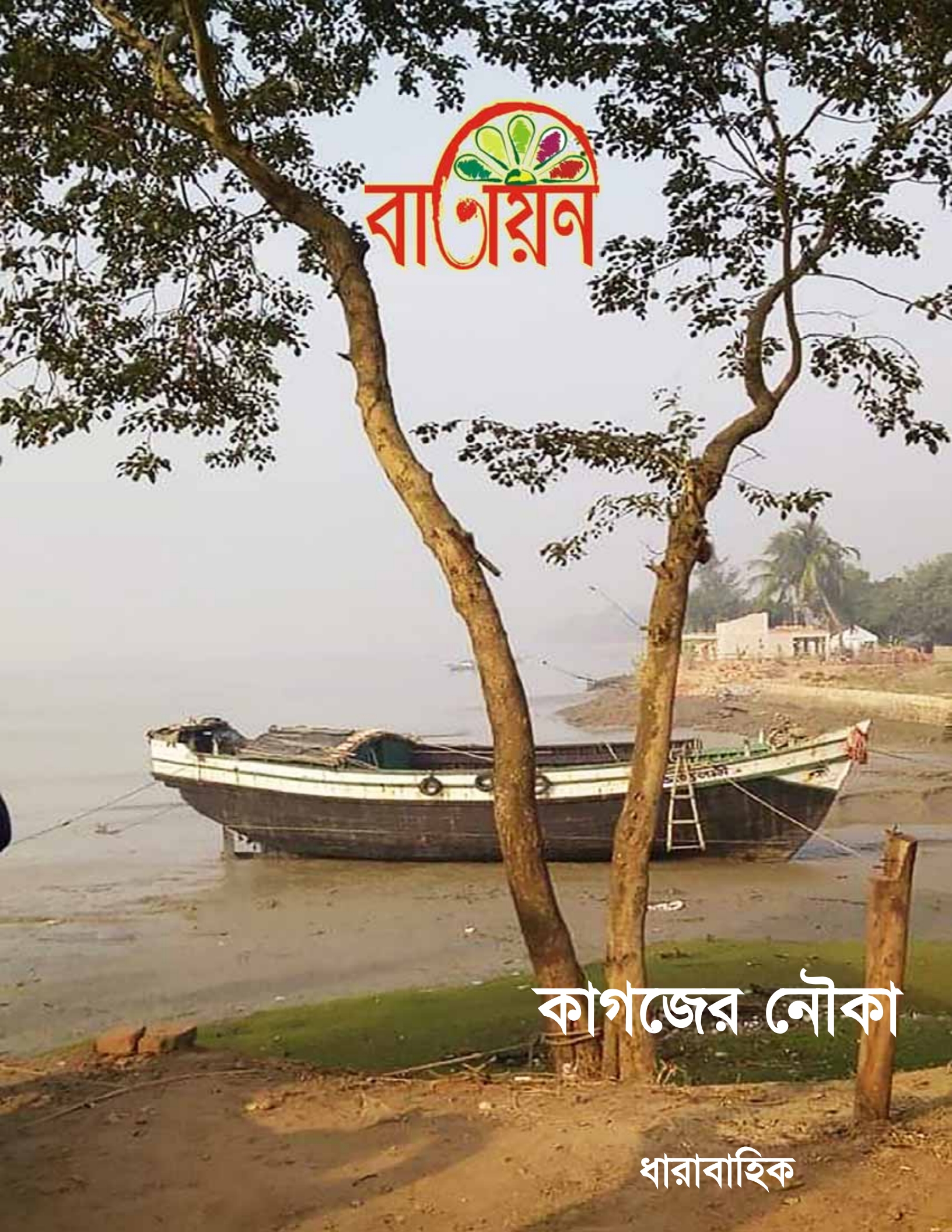

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

ধারাবাহিক

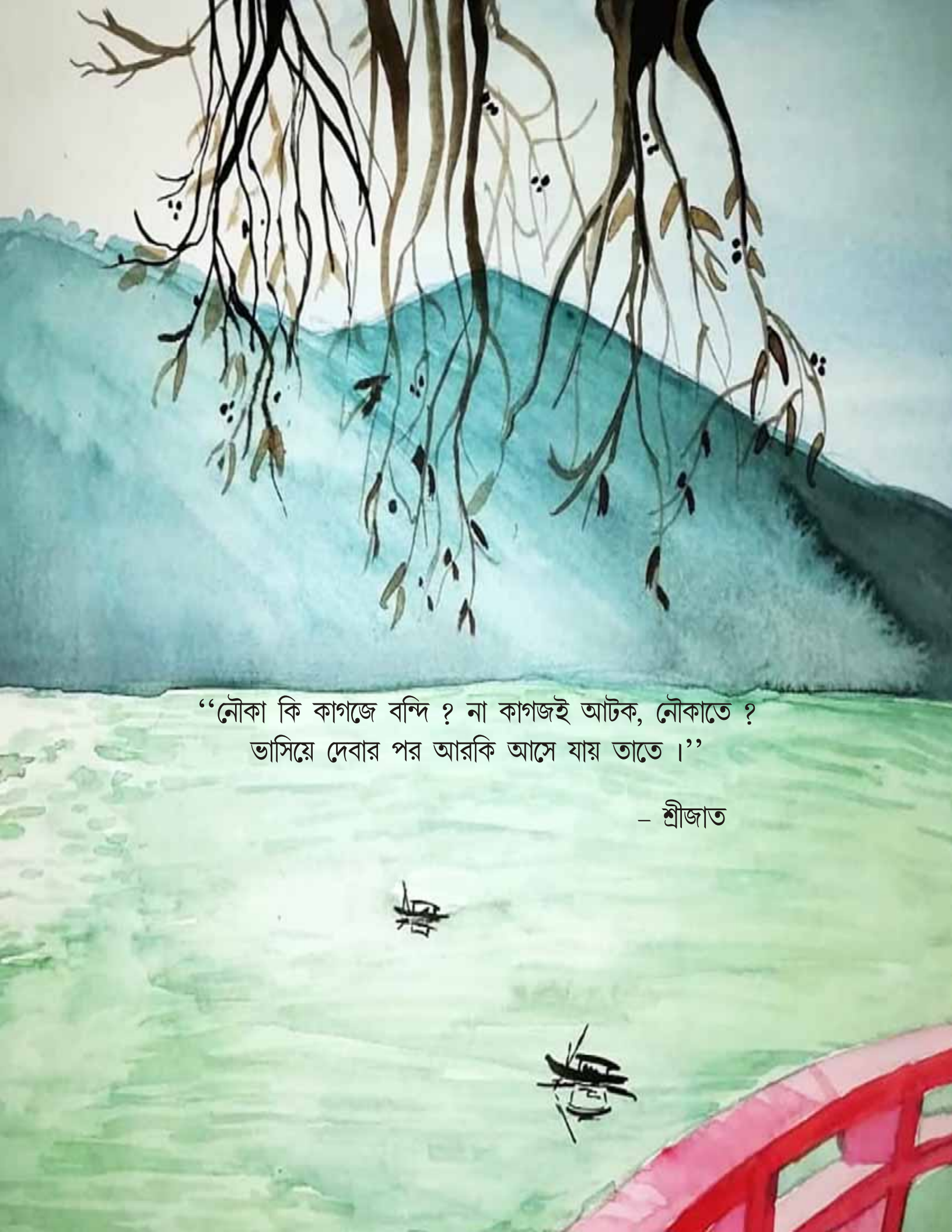

''নৌকা কি কাগজে বন্দি ? না কাগজই আটক, নৌকাতে ?
ভাসিয়ে দেবার পর আরকি আসে যায় তাতে ।''

– শ্রীজাত

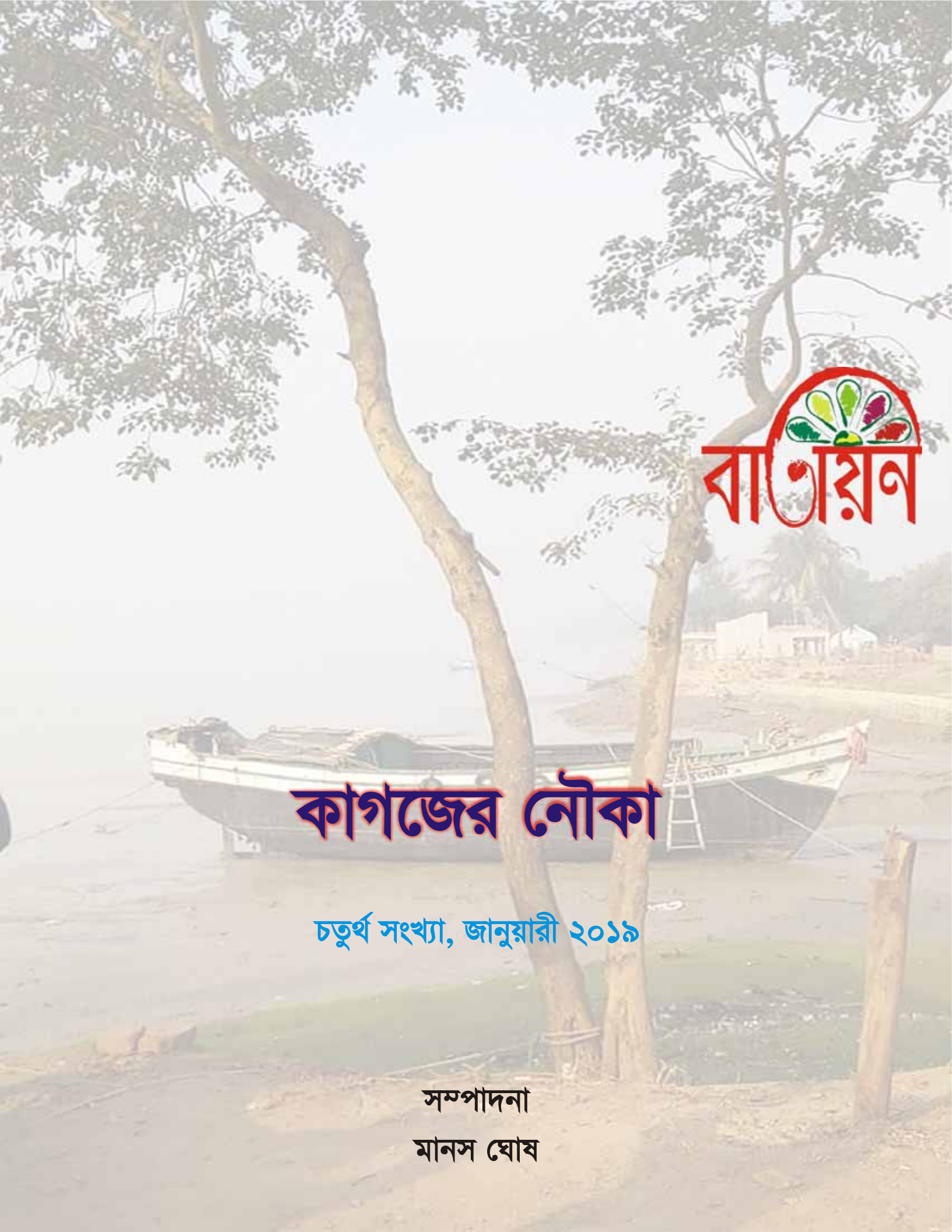

বাতায়ন

কাগজের নৌকা

চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১৯

সম্পাদনা

মানস ঘোষ

Issue Number 4 : January 2018

Editor
Manas Ghosh, Kolkata, India

Editorial Team
Ranjita Chattopadhyay, IL, USA
Jill Charles, IL, USA (English Section)

Coordinator
Manas Ghosh, Kolkata, India
Snehasis Bhattacharjee, Kolkata, India

Networking & Communication
Biswajit Matilal, Kolkata, India

Design and Art Layout
Kajal & Subrata, Kolkata, India

Website Design and Support
Susanta Nandi, India

Published By
BATAYAN INCORPORATED
Western Australia
Registered No. : A1022301D
E-mail: info@batayan.org
www.batayan.org

Concept & Production
Anusri Banerjee

Photo & Artwork Credit

Benjamin Ghosh **Front Cover & Illustrations**

বেঞ্জামিন ঘোষ (মাঙ্গল্য) এখনো স্কুলছাত্র। তবে তার যাবতীয় আগ্রহ আবর্তিত হচ্ছে, ছবি আঁকাকে ঘিরে । পেন্সিল স্কেচ, রং-তুলি ছাড়াও সে ভালবাসে বিভিন্ন অপ্রচলিত উপাদানকে শিল্পের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে। অন্যান্য কাজের সঙ্গে নিয়মিত কমিক্স এঁকে চলেছে ছোটদের একটি শিক্ষামূলক পত্রিকার জন্য । বাতায়নের ধারাবাহিক পত্রিকায় বেঞ্জামিনের এই প্রথম কাজ । অতএব আমাদের সঙ্গে সেও তাকিয়ে আছে পাঠকের প্রতিক্রিয়ার দিকে ।

''বাতায়নের ৫-এ পা'' **Back Inside Cover**

Collective photos of programm held on 6th January, 2019

Tirthankar Banerjee **Back Cover**

His interest in photography started in student days. Much later the long nights in the dark-room were replaced by hours behind the computer and focus shifted from Black & White to Colour. He likes to show the images as they are and does not approve of computer gimmickry. He loves nature – flowers, birds, trees and all things beautiful. Tirthankar is an engineer, specializing in Renewable Energy and lives and works in Perth, Western Australia.

বাতায়ন পত্রিকা **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia** দ্বারা প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত । প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া, এই পত্রিকায় প্রকাশিত যে কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা যে কোন ভাবে ব্যবহার নিষিদ্ধ । রচনায় প্রকাশিত মতামত সম্পূর্ণ ভাবে রচয়িতায় সীমাবদ্ধ ।

Batayan magazine is published by **BATAYAN INCORPORATED, Western Australia**. No part of the articles in this issue can be re-printed without the prior approval of the publisher. The editors are not responsible for the contents of the articles in this issue. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not representative of the Batayan Committee.

সম্পাদকীয়

সুধী,

সবাইকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। হয়তো একটু দেরীই হয়ে গেল। এছাড়া বোধহয় উপায়ও ছিল না আর। ক্রমাগত মৃত্যুসংবাদের অভিঘাতে বাংলা সাহিত্যজগতের বর্ষবরণের উচ্ছ্বাস গ্রাস করে নিয়েছিল শোক আর স্মৃতিতর্পণের আবহ। ২৫শে ডিসেম্বর প্রবাদপ্রতিম কবি নীরেন্দ্রনাথ চলে গেলেন। তারপরের কয়েকদিনের মধ্যেই বিশ্ববরেণ্য পরিচালক মৃনাল সেন, কবি পিনাকী ঠাকুর, সাহিত্যিক দিব্যেন্দু পালিত, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, একের পর এক নক্ষত্রপতন।

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহবেদন লাগে
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে।

মৃত্যু জীবনেরই এক পরম এবং অনিবার্য সত্য। শোকে আমরা সাময়িকভাবে বিহ্বল হয়ে পড়ি। তবু ঘুরে দাঁড়াই। আমাদের ঘুরে দাঁড়াতেই হয়, কারণ আমরা আগামীর কাছে দায়বদ্ধ। পূর্বজদের অসামান্য সৃষ্টির ফসল, যা নীরেন্দ্রনাথের কবিতা বা মৃনাল সেনের সিনেমার ভাষ্য হয়ে প্রোথিত আছে আমাদের সংস্কৃতির শিকড়ে, তার বহমানতা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে আমাদের এই সাহিত্যসংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়েই। তাই কাগজের নৌকার এই ধারাবাহিকতা, তাই বাতায়নের উন্মুক্ত পরিসরে "৫এপা" এর গুণীসমাবেশ।

কাগজের নৌকার ধারাবাহিকগুলি গত সংখ্যায় যে আশ্চর্য বাঁকে এসে থেমেছিল, বেশ বুঝতে পারছি নিয়মিত পাঠকের কৌতূহল এতদিনে আকাশ ছুঁয়েছে। তাই আর দেরী নয়, সুদীপা কি কোনো নতুন বিপদে পড়লো, কী হয়েছিল যশোধারার, পালির প্রেমের সনেটভাষ্য, সুনীল ও স্বাতীর সান্নিধ্যের স্মৃতি অথবা লাদাখের রূপকথা জানার জন্যে পড়তে শুরু করুন এবারের কাগজের নৌকা। নিজে পড়ুন, অন্যদেরও পড়ান।

নতুন বছরে সবার জন্য রইল শুভকামনা। ভালো থাকবেন।

মানস ঘোষ
সম্পাদক/কাগজের নৌকা

সূচীপত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু	হটাবাহার	5

স্মৃতিকথা

সিদ্ধার্থ দে	সুনীল সাগরে	27

বড় গল্প

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য	অচেনা ঢেউয়ের শব্দ	31

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল	সেল্ফি স্বরূপ	35

কবিতা

পল্লববরন পাল	সনেটগুচ্ছ	37

ভ্রমণ

মৌসুমী রায়	লাদাখ ভ্রমণ	38

নাটিক

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী	তিন শালিখ	41

বইপাড়া 57

ধারাবাহিক উপন্যাস

নবকুমার বসু

হটাবাহার

পর্ব ৪

(৬)

আগামীকাল রবিবার, ষোলই জানুয়ারী, সুদীপা ফ্লাই করবেন নিউক্যাস্‌ল এয়ারপোর্ট থেকে । দুপুর দুটোয় উড়ান । দুবাই-এ প্লেন পালটে কলকাতা পৌঁছানোর কথা পরের দিন সকাল সওয়া আটটায় । ঘন কুয়াশার জন্য ইদানীং দুষণ সংক্রান্ত অধিকাংশ ভারতীয় বিমানবন্দরে প্লেন-এর নামা-ওঠার সময় প্রায়ই গন্ডগোল হয়ে যায় । বিশেষ করে সকালের দিকেই অনিশ্চয়তা বেশি । কিছু করার নেই । কম্পিউটার স্ক্রীনে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রির ওয়েদার ফোরকাষ্ট দেখছিল রঞ্জনা মার জন্য ।

দোতালার শোওয়ার ঘরে একটু তফাতেই হ্যান্ডব্যাগ গোছাচ্ছিলেন সুদীপা । বড় সুটকেসটা আগেই গোছানো হয়ে গিয়েছিল । জামা-কাপড়, জুতো-চটি-কসমেটিক্‌স এবং শেষপর্যন্ত নেব না নেব না করেও দু-চারটে ছোটখাট উপহার সামগ্রীও না নিয়ে পারেন নি । তালা আটকে সেই সুটকেস নীচে নামিয়েও রেখেছেন । জরুরী জিনিস সব হ্যান্ড ব্যাগে নিতে হবে । এক এক করে তুলছেন । কিন্তু মনটা বাইরের আবহাওয়া আর প্রকৃতির মতোই অবসাদসিক্ত-নিস্প্রভ, উদাস । নেহাৎ দেশে, বাড়িতে যেতে হবে, তাই গোছগাছ করছেন । আনন্দ-উদ্যম-উৎসাহ কোনোটাই নেই । যে মানসিক অবলম্বন পাবেন বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, রজতাভর মৃত্যুর পর থেকে, কোথায় যেন সেই আগ্রহের সঙ্গে মিশে গেছে উৎকণ্ঠা-অশান্তি-অবিশ্বাস... সব মিলিয়ে বিভ্রান্তি ।

কম্পিউটর দেখতে দেখতে রঞ্জনা বলল, মা... মনে হচ্ছে ডে-আফটার টুমরো ক্যালকাটা ওয়েদার ইজ গুড । সুদীপা আলগা ভাবে বললেন, এসময় কলকাতার আবহাওয়া... এমনিতে তো ভালোই থাকে... সকালে কিরকম কুয়াশা হবে... । রঞ্জনা বলল, ফোরকাষ্ট বলছে, রাত্তির থেকেই পরিষ্কার... নো ফগ্‌ ইন দ্য মর্নিং... ।

মাথা নাড়লেন সুদীপা । হলেই বা আর করার কী আছে... সকালে না পৌঁছে দুপুরে পৌঁছাব ।

রঞ্জনা মুখ ঘুরিয়ে বলল, বাট মাসি মাস্ট নো দ্যাট... তোমাকে পিক আপ করতে আসবে তো... !

সে... ওরা ওখান থেকে ঠিকই জেনে নেবে ।

বিফোর দ্যাট... আমি একটা কল করে বলে দিই ?

বললে... বলতে পারিস, কিন্তু তেমন খুব একটা দরকার কিছু নেই ।

রঞ্জনা কাঁধ ঝাঁকালো । ওয়েল... ইফ য়্যু ডোন্ট ওয়ান্ট... তোমার সুবিধের জন্যই বলা... ।

ব্যাগ গোছাতে-গোছাতেই আনমনা সুদীপা । সুবিধে নাকি অসুবিধে... কী অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়ব... ভগবান জানেন !

মেয়ে ঘুরে তাকিয়েছে মা-এর দিকে । রিভলভিং, চাকা লাগানো চেয়ার কার্পেটের ওপর দিয়েই টেনে নিয়ে এলো সুদীপার কাছাকাছি । বলল, মা, কলকাতা যাওয়ার জন্য তোমার কোনো এনথু-এনার্জি নেই, তাই না !

সুদীপা বললেন, এবারের পরিস্থিতিই যেরকম, কোনো কিছুই থাকার কথা না । কিন্তু তাহলেও, যা সত্য, প্র্যাক্টিক্যাল... তা তো মানুষকে মানতেই হবে । আমিও নিজেকে সেইভাবে তৈরি করে নিচ্ছিলাম । কিন্তু তখন কি জানতাম... নিজেদের ফ্যামিলির মধ্যেই আমাকে এমন বিপদে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে কেউ ! তারপরে কি আর কোনো এনার্জি থাকে?

রঞ্জনা একটু ভেবে বলল, ডু য়্যু রিয়্যালি থিংক মা... ওই ইমেলটা সামথিং সিরিয়াস ?

সিরিয়াস না — হলে পাঠাবে কেন ?

কিন্তু সোনামাসি তো তোমাকে কোনোদিন... কিছু বলেনি, হিন্ট্ দেয় নি ! দিয়েছে?

সেইজন্যই তো আরও বেশি চিন্তার... মুনিয়া । নিজে মুখে কিছু না বলে, একেবারে গোড়া থেকেই আটঘাট বেঁধে... ল ইয়ারকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে...।

রঞ্জনা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, কী কী... কী ঘাট বেঁধে লইয়ারকে... ।

সুদীপা বললেন, আটঘাট বেঁধে... মানে হচ্ছে, সবদিক ভেবেচিন্তে, প্রিপারেশন নিয়ে... । আগে থাকতে সোনাদি কোনোদিনই আমাকে কিছু বলেনি, হিন্ট্ দেয়নি যে, আমার ফ্লোরটা ওরা...।

রঞ্জনা মাঝখানেই বলল, কিন্তু মা, সোনামাসির ছেলে অপুদাকে তুমি কি তোমার ফ্লোরটা ভাড়া দিয়েছিলে ?

না - না, তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না । সোনাদি রিকোয়েষ্ট করেছিল... এমনিই থাকতো... ।

কিন্তু সোনামাসির লইয়ার তো সেই কথাই লিখেছে যে, ওরা তোমার টেনান্ট... আই মিন ভাড়াটে... !

সেই দেখেই তো আমি আকাশ থেকে পড়েছি... অবাক হয়ে গেছি... ।

তুমি সোনামাসিকে বললে না... যে তোমার লইয়ার মিথ্যে কথা লিখে আমায় ইমেল পাঠিয়েছে কেন ?

সুদীপা কিছুক্ষণ চুপচাপ মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন । তারপর একটা হাসির মতো শব্দ করে বললেন, তোর কথা শুনে হাসবো, না কাঁদবো... বুঝতে পারছি না ।

হোয়াই মা ? যেটা সিম্প্‌ল... সেটাই তো আগে করা উচিত ।

সুদীপা শ্বাস ফেলে স্বগতোক্তির মতো বললেন, তোদের মতো সরল ভাবনা নিয়ে মানুষ চলতো... !

কী বলছো মা... বুঝতে পারছি না ।

থাক, ছেড়ে দাও । তোমার এসব বুঝে আর কাজ নেই... সামনে পরীক্ষা, নিজের ভাবনা ভাবো ।

রঞ্জনা তারপরেও বলল, ওরা একটা ভুল কথা বলছে... অথচ তুমি প্রোটেস্ট করছো না ।

একটু চুপ করে থেকে সুদীপা বললেন, শোন মুনিয়া, কেউ যদি ইচ্ছে করে... কোনো একটা উদ্দেশ্য নিয়ে মিথ্যে কথা বলে, তখন সেটা আর 'ভুল' থাকে না । তুই বুঝতে পারছিস না যে, সোনাদিরা ইচ্ছে করেই আমার ফ্লোরটা দখল করে রাখতে চায় । যে কারণে, আমাকে কিছু বলার আগেই একেবারে উকিলের চিঠি দিয়েছে... যা, ইচ্ছে থাক বা না থাক, আমি যেন কিছু বলতে না পারি...।

তার মানে... ওরা জোর করে ইল্লিগ্যালি তোমার ফ্ল্যাটটা অকুপাই করে রাখছে।

তাইতো দাঁড়াচ্ছে।... কিন্তু আমি যাতে ইল্লিগ্যাল বলতে না পারি, সেইজন্য প্রথম থেকেই নিজেদের টেনান্ট বলে এস্টাব্লিশ করতে চাইছে, এবং সেই জন্য লইয়ার'কে দিয়ে আমাকে ইনফর্ম করেছে।

সোনা মাসিরা কি তোমার ফ্লোরটা মেরে দিতে চাইছে মা ?

কী যে চাইছে...!

বাট হাউ ইজ দ্যাট পসিবল মা ! তোমার তো ডকুমেন্টস আছে। দাদুভাই উইল করে তোমাদের তিন সিস্টারকে বাড়ির তিনটে ফ্লোর দিয়ে গেছে... দিদিমা ইজ স্টিল এ্যালাইভ, শি অলসো নোজ্ এভরিথিং। সোনামাসিরা কি করে... !

মেয়েকে থামিয়ে দিয়ে সুদীপা বললেন, আমাদের দেশে, পার্টিকুলারলি ওয়েষ্টবেঙ্গল এবং কলকাতায় এভরিথিং ইজ পসিবল।

তবে সোনাদিরা কী উদ্দেশ্যে ওসব করেছে... আমি সব তো জানিনা...। গিয়ে কথা বললে... আশা করি বুঝতে পারব। কিন্তু ওটা নিয়ে তোরা মাথা ঘামাস না...। দেখা যাক...।

মুনিয়া ঝুম হয়ে বসে ছিল কয়েক মুহূর্ত। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতে যেতে বলল, আই ক্যান্ট থিংক যে... সোনামাসিদের মতো নিয়ারেষ্ট রিলেটিভরা এতো মিন আর নাস্টি হতে পারে...।

সুদীপা মেয়ের ভাবনায় একটু প্রলেপ দেওয়ার মতো বললেন, এখনই ওভাবে ভাবিস না মুনিয়া। আগে আমি গিয়ে কথা বলি... তারপর বোঝা যাবে আসলে... কেন আর কিজন্য ইমেলটা পাঠিয়েছিল...।

ঘর ছাড়ার আগে রঞ্জনা বলল, আমি ঠিকই বুঝেছি মা ওদের ইন্টেনশনটা ভাল না... ইন্ডিয়াতে ওরকমই হয়।

ওরা যদি আমাকে একটা টেলিফোন করে বলতো... !

সেটাই তো ইন্টেনশনালি করেনি মা.. ইটস নিয়ারলি থ্রি উইকস্...। ঘর থেকে বেরুতে গিয়েও গেল না মুনিয়া। বলল, তাছাড়া ওদের লইয়ার তোমার ইমেল এ্যাড্রেসই বা পাবে কি করে... !

সুদীপা নিজের মনে কথা বলার মতো বললেন, রূপা বোধহয় কিছুদিন আগে থাকতে কিছু একটা অনুমান করছিল... আমাকে স্পষ্ট করে না বললেও... এখন মনে হচ্ছে.. বাড়ির ব্যাপারে একটা হিন্ট্ দিতে চাইছিল...।

মুনিয়া কিছুটা অবাক ভাবের মধ্যে বলল, সোনামাসি এ্যান্ড হার হাজব্যান্ড বোথ আর ডক্টরস, কোয়াইট ওয়েল অফ্ ফাইনানসিয়ালি..., ছেলে বড় হয়ে গেছে... নিজেদের দু তিনটে বাড়ি আছে...।

সুদীপা মাঝখানে বললেন, তাছাড়া আমাদের ওই বাড়িতেও তো একটা ফ্লোর সোনাদির...।

তা সত্বেও তোমারটা অকুপাই করতে চাইছে কেন !

কী জানি... আমি বিদেশে থাকি বলেই হয়তো... ভাবছে...।

কিন্তু তুমি তো ইন্ডিয়াতে ফিরেও যেতে পারো... তোমার ওভারসিজ সিটিজেনশিপ আছে... নিজেদের বাড়িও আছে। একটু থেমে মুনিয়া বলে ফেলল, আমি তোমাকে বলছি মা... সোনামাসিরা আসলে তোমার প্রতি খুব জেলাস...। এ্যান্ড দে আর গ্রিডি।

কথাটা বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মুনিয়া। আর 'জেলাস' শব্দটা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়ে চলল সুদীপার মাথায়।

সত্যিই কি সোনাদিরা হিংসে করেন ওদের ! কিন্তু কেন ? কোনোদিক থেকেই কি ওদের হীনমান্যতার কোনো কারণ আছে। নাহ... এই মুহূর্তে আর ভাববার সুযোগ নেই সুদীপার । বরং মাথা ঠান্ডা করে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো হ্যান্ডব্যাগে ভরা আরও বেশি দরকার । বাড়ির দলিল-এর কপি এবং বাবার উইল এর একটা কপিও সঙ্গে নিতে হবে । তাছাড়াও কাজ আছে। এ বাড়ির সমস্ত জানালা-দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করতে হবে। কিছু পর্দা খোলা আর কিছু বন্ধ করে রাখতে হবে। ওপরে নীচে দু জায়গাতেই দুটো আলো জ্বলার ব্যবস্থা করে যেতে হবে টাইমারে... তারপর টিকিটের অনলাইন চেক ইন আছে দুপুরবেলা । সেটা অবশ্য মুনিয়াই করে দেবে মায়ের জন্য । ফ্রিজ খালি করতে হবে... রান্না খাবারদাবার সব গুছিয়ে দিয়ে দেবেন মেয়েকে... কাল বেলা এগারটায় ট্যাক্সি আসার কথা, তাকে আর একবার রিমাইন্ডার দিতে হবে... বিদিশার কাছে একটা চাবি... ।

একের পর এক কাজের ভাবনাগুলো মাথার মধ্যে ওড়াউড়ি করলেও, সুদীপা বুঝতে পারেন, কোথাও একটা... নাকি একাধিক অস্বাচ্ছন্দ্যের অনুভব তাঁকে ছুঁয়ে রয়েছে। চেষ্টা করেও সেই স্পর্শগুলো থেকে যেন রেহাই পাচ্ছেন না। রজতাভর মৃত্যু পরবর্তী নিঃসঙ্গতা থেকে তাঁর উদ্বার পাওয়ার উপায় নেই, সুদীপা জানেন। এ এক এমনই কঠিন সত্য এবং বাস্তবতা, যাকে মানতে হবে; এবং তা নিজের প্রয়োজনেই, নিজের জীবদ্দশাকে বহমান রাখার জন্য।

কিন্তু বিগত চার মাসের ওপর সেই অনিবার্য জীবনযাপনটা করতে গিয়ে সুদীপা টের পেয়েছেন, যেন প্রতিদিনই তিনি একটু একটু করে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এমনও মনে হয়েছে, বিগত অর্ধশতাব্দীর জীবদ্দশায় যে অভিজ্ঞতা হয় নি, হওয়ার সম্ভাবনার কথাও মাথায় আসে নি, তা যেন এই নতুন যাপন প্রক্রিয়ার শর্ত হিসাবেই তাঁকে অভিজ্ঞ করে তুলছে।

একা মানুষের সামাজিক ভূমিকা এবং অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন সুদীপা।

আবার মধ্যবয়সিনী হলেও, একা মহিলার জীবনযাপন সম্পর্কে অন্যদের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অনেককিছু যেন আপনা-আপনিই জেনে ফেললেন সুদীপা চারমাসের মধ্যে। এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, সেইসব প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতায়... সুদীপা ভাবেন, কী জানি... কখনও উল্লসিত-ক্ষুব্ধ-বেদনাহত-কৌতুককর... নাকি সব মিলিয়ে ঋদ্ধ-ই হয়েছেন বলা উচিত।

অসময়ে অকস্মাৎ রজতাভ চলে গিয়ে, বুঝি আরেকটি অন্যরকম জীবন-ই দান করে গেলেন সুদীপাকে।

অর্থনৈতিক দিক থেকে, রজতাভ চলে যাওয়ার পরে এবং কারণে, সুদীপা অবশ্যই যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছেন। এমনকী তাঁর কোনো ধারণাই ছিল না যে কতটা সচ্ছল হয়ে উঠতে পারেন। হিসেব করে দেখেছেন, রজতাভর সরকারি পেন্সনের অর্ধেক, প্রাইভেট পেন্সন এবং শেষপর্যন্ত নিজেও সেই পুরোনো চাকরির শর্ত অনুযায়ী যা পান, সব মিলিয়ে প্রতিমাসে তাঁর একা মানুষের পক্ষে যথেষ্ট রোজগারই বলা উচিত। অবশ্য একা মানুষ হলেও, বাড়ির খরচ আর কতটাই বা কমে ! তাসত্বেও বার্চভিউ ক্লোজ এর এই বাড়ির সব ঋণ শোধ হয়ে গেছে বলেই, এখনও তাঁর হাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে প্রতি মাসে।

কিন্তু তাঁর আসল সঞ্চয় তো ব্যাঙ্ক -এ।

সত্যি বলতে কী, একসঙ্গে এতো হাজার পাউন্ড তাঁর একার ব্যাঙ্ক-এ্যাকাউন্টে কোনোদিন থাকবে, এই কল্পনাই করতে পারেন নি সুদীপা। রজতাভর লাম্পসাম পরিমাণের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে, অকল্পনীয়ভাবে পাওয়া তাঁর নিজস্ব এককালীন অর্থ। এই সবের ওপরেও যুক্ত হয়েছে-যা কিছু সঞ্চয় প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছিলেন রজতাভ। আর সত্যি যদি এখন তাঁর পূর্ণ সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণ করতে হয়, তাহলে সিল্ক উইলোবির এই বাড়ির দামই তো সাড়ে তিন লক্ষ পাউন্ড। দুখানা গাড়ির ও একটা প্রায় নতুন।

কাছের মানুষ এবং প্রিয়জন হিসাবে সুনন্দন পরামর্শ দিয়েছিলেন সুদীপাকে যে এতোটাকা ব্যাঙ্কে ফেলে রাখার কোনো মানে হয় না। সুদীপা নিজেও যে তা বোঝেন না, তা নয়। কিন্তু বিনিয়োগের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং উপায় সম্পর্কে তিনি

ওয়াকিবহাল হতে চান। যে কারণে ক্রিসমাসের আগে যখন কয়েকজন বন্ধুকে বাড়িতে ডেকেছিলেন, তখন সৌমেনের কাছে কিছু খোঁজ খবর নিয়েছিলেন।

জয়া-র স্বামী সৌমেনও চিকিৎসক। নিজেদের পরিচিত বন্ধু তালিকায় একজন। অর্থনৈতিক বিনিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে সৌমেন-এর জ্ঞান এবং বুৎপত্তির বিষয়ে সকলেই অবগত। আবার রজতাভর মৃত্যুর পরবর্তী পর্যায়ে সুদীপার এ্যাকাউন্টে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হবে, সে তথ্যও সকলের জানা। সুতরাং নিজেদের বন্ধুবৃত্তের মধ্যে সৌমেনের পরামর্শ চাওয়াটাই স্বাভাবিক সুদীপার। কিন্তু আড্ডার পরিবেশে স্বাভাবিক-ভাবেই সেদিন ওই আলোচনা গুরুত্ব পায়নি। তাছাড়া বন্ধুর মৃত্যুর পরবর্তী জমায়েতে, তারই বাড়িতে, স্মৃতি ভারাক্রান্ত হয়ে থাকাটা খুবই সম্ভব। সৌমেন কথা দিয়েছিলেন, এই বিষয়ে একদিন নিরিবিলিতে তিনি সুদীপার সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করবেন।

যথারীতি বিগত সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে সেই সুযোগটি আর হয়নি।

বিষয়টির গুরুত্ব সুদীপার মাথা থেকে যায় নি... অথচ কলকাতা রওনা হওয়ার দিনটি এসে পড়ল। শুধু এসে পড়ল তাই না। সঙ্গে একরাশ অপ্রত্যাশিত, অস্বস্তিকর দুর্ভাবনাও যেন দখল নিয়েছে সুদীপার মাথায়। সঙ্গে নিয়েই যেতে হবে কলকাতায়।

মোটামুটি ব্যাগ গুছিয়ে উঠে পড়লেন সুদীপা।

ঠান্ডা আর মেঘলা আবহাওয়ায় বেশ বোঝা যায় না। তাসত্বেও সচেতন হলেন এগারটা বাজে। মুনিয়া ফিরে যাবে ওবেলা। রান্না করা খাবার-দাবার যা আছে মেয়েকে দিয়ে দেবেন। প্রায় দু-মাস কলকাতায় থাকবেন সুদীপা — মার্চ-এর চোদ্দ তারিখে রিটার্ন বুক করা আছে। এতোদিন ধরে ফ্রিজ বন্ধ করেও রাখা যাবে না, আবার খাবারদাবার ও রাখা চলবে না। দু-মাস বাড়ি তালা বন্ধ করে রেখে যাওয়ার অনেক ভাবনা। বিদিশার কাছে চাবি থাকলেও, নেহাৎ অতিরিক্ত তুষারপাতে সবকিছু অচল না হয়ে গেলে... ও আর কিজন্যই বা আসবে!

বাড়ির বাইরে, গ্যারাজে আর বাগানের টুকটাকি কাজগুলো আগেই সেরে ফেলেছেন সুদীপা।

ঘরের ছোটখাট ব্যাপারগুলো দেখে নিতে নিতেই টের পাচ্ছিলেন, মনটা কিছুতে যেন বশে থাকছে না। নানান ভাবনার সঙ্গে আবেগের মিশ্রণে বারবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আর শেষপর্যন্ত অন্যান্য বিষয়গুলো সরে-সরে গিয়ে, সোনাদির সেই উকিলের চিঠির ব্যাপারটাই বড় বেশি যেন বাজছে। যদিও সোনাদির বড় ছেলে অপুর কথা উল্লেখ করেছে... তাহলেও...।

সেদিন প্রথমে সেই উকিল ভদ্রলোকের টেলিফোন পেয়ে কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন সুদীপা। বেরোনোর তাড়া ছিল বলে কম্প্যুটার খুলে ই-মেল দেখার ও সুযোগ ছিল না তখন। ব্যাংকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। তারপর বাজার দোকান। ফিরে এসে রান্না — সন্ধেবেলা ঘনিষ্ঠ কয়েকজনকে আসতে বলেছিলেন।

কম্প্যুটার খুলে ই-মেল দেখতে দেখতে পরের দিন বেলা এগারটা।

আর পিডিএফ — করে পাঠানো উকিলের সেই চিঠিটা পড়তে পড়তে যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়েছিলেন সুদীপা। কী সব আজেবাজে কথা লিখেছে রে বাবা উকিলটা! অপু আবার তাঁর বাড়ির ভাড়াটে হল কবে!

মৃত্যুর অনেক বছর আগেই অমলেন্দুবাবু বাড়ির তিনটি ফ্লোর তিন মেয়ের নামে লিখে দিয়েছিলেন। একতলা বড়মেয়ে সুতপার, দোতালা সুদীপার এবং তিনতলা ছোট মেয়ে সুরূপার — যেখানে বরাবর তিনি নিজেও বসবাস করেছেন। ছ-বছর আগে তিনি প্রয়াত হওয়ার পরে এখন ও প্রীতিলতা এখানেই থাকেন। একতলা-দোতালা ভাড়া দেওয়া ছিল বরাবর। প্রাপ্ত অর্থ অমলেন্দুবাবু ও তাঁর পরিবার নিজেদের জীবদ্দশায় ব্যবহার করবেন, তেমনই ব্যবস্থা করা ছিল। বাড়ির আত্মীয় স্বজন, চেনা-পরিচিত সকলেই যাতায়াত ছিল তিনতলায়। সামাজিক ভাবে মাননীয়, পরিচিত মানুষ অমলেন্দু-প্রীতিলতা।

সুতপা এবং তাঁর স্বামী উভয়েই চিকিৎসক, সন্তোষপুরের পালবাজারে প্র্যাকটিস করেন । পিতৃবিয়োগের পরেই সুতপা বাড়ির একতলায় আর একটি চেম্বার করবেন বলে দখল নেন । ভাড়াটেকে নোটিশ দিয়ে উচ্ছেদ করেন । প্রীতিলতা আপত্তি করতে পারতেন । কিন্তু তিনি সেরকম মানুষ না । তাছাড়া মেয়ের প্রয়োজনের কাছে তাঁর মাসে মাসে কিছু অর্থ প্রাপ্তি নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল । বাস্তব ক্ষেত্রে অবশ্য সুতপা চেম্বার করেন নি নিজের একতলাটিতে । নতুন ভাড়াটে বসিয়েছিলেন বেশি ভাড়ায় ।

সুদীপার দোতালা যথারীতি ভাড়া দেওয়া ছিল আগের মতোই । তিনি প্রবাসী । ভাড়ার টাকা যেত মায়ের হাতে । মাত্র দেড়বছর আগেই বহুদিনের পুরনো, প্রায় আত্মীয়ের মতোই ভাড়াটে নিশীথবাবুরা চলে গিয়েছিলেন ফ্ল্যাট কিনে । প্রীতিলতা নিজেই আর ভাড়া দিতে চাননি । সুদীপাকে বলেছিলেন, কলকাতায় নিজের বাসস্থান হিসাবে দোতালাটি সাজিয়েগুছিয়ে নিতে । সুদীপা খুশি হয়েছিলেন । রূপা এবং চঞ্চল এর ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন তাঁর অংশটিকে ছিমছাম করে তোলার জন্য এবং খালিই রেখে দিয়েছিলেন । প্রীতিলতার অর্থাভাব ছিল না । তাছাড়া প্রয়োজনে মেয়েরা, বিশেষ করে, সুদীপা তো ছিলেন ই ।

বছরের গোড়ার দিকে সোনাদির অনুরোধেই সুদীপা তাঁর বোনপো অপু কে থাকতে দিয়েছিলেন, তাঁর সাজানো-গোছানো দোতলায় । ছোটবেলা থেকে অপুকে দেখছেন সুদীপা মাসি হিসেবে । সদ্য বিবাহিত ওর নিজস্ব ফ্ল্যাট তখন ও বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি । সোনাদির অনুরোধ ফেলতে পারেন নি সুদীপা । সাময়িকভাবে, গত মার্চ মাস থেকে সুদীপা সরল মনেই অপুকে নতুন বউ নিয়ে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন তাঁর খালি পড়ে থাকা দোতালায় । বাইরের লোক তো না । দিদির ছেলে ।

সূক্ষভাবে একবার মনে এসেছিল সুদীপার — সোনাদি নিজেই বড় ফ্ল্যাট কিনেছে কসবার দিকে, অপু তো সেখানেই থাকতে পারতো নেহাৎ যদি...। কিন্তু লেকগার্ডেন্স থেকে ওর নাকি অফিস যেতে সুবিধে হবে... ।

দূর বিদেশ থেকে সুদীপা আর বিশেষ কিছু তলিয়ে ভাববার অবকাশ পাননি । চাননি ও ।

কিন্তু সেই সব সরলমাত্রা, উদারতার প্রতিদান কি আজ এই উকিলের চিঠি ! বেশ গুছিয়েই দেবকান্ত মিশ্র নামের এ্যাডভোকেট লিখেছেন, আমার মক্কেল শ্রী অপরেশ মজুমদার... (অপু) সান অফ প্রবীর এ্যান্ড সুতপা মজুমদার... আইনত প্রতিমাসে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে আপনার ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকে... সব অফিসিয়াল ডকুমেন্টস্ থাকা সত্বেও আপনি তাকে বেআইনিভাবে এবং বলপূর্বক উচ্ছেদ করতে চাইছেন... শ্রী মজুমদার একজন স্থানীয়, শ্রদ্ধেয় সমাজসেবী... দায়িত্বশীল নাগরিক... ।

একের পর এক মিথ্যা, তার ওপর মিথ্যা... তার ওপর আবার রং-চড়ানো কাল্পনিক অভিযোগ... অবাস্তব পরিচয় প্রদান... পড়তে পড়তে কখন যেন ক্ষুব্দ, ক্রদ্ধ হতেও ভুলে গিয়েছিলেন সুদীপা । মনে হচ্ছিল বিভ্রান্ত অসহায় অপমানে বুক ধড়ফড় করছে । চিনচিন ব্যথা অনুভূত হচ্ছে বুকের মধ্যে । সামনা-সামনি কেউ অভিযোগ জানালে, এমনকী আক্রমণ করতে এলেও, নিজেকে সুরক্ষার সুযোগ পাওয়া যায় । কিন্তু কেউ যদি নীরবে মিথ্যা অভিযোগ, তিরস্কারে, অপমানে বিদ্ধ করে, তা অত্যাচারের ও অধিক দগ্ধ করে ।

উকিলের চিঠির শেষ দিকে প্রচ্ছন্নভাবে শাসানির আভাস ছিল । তাছাড়াও...

উল্লেখ করা ছিল, মক্কেলকে এরপরেও বিব্রত করলে, আইনানুগ ব্যবস্থাগ্রহণে ইতস্তত করা হবে না ।

সুদীপার মনে হয়েছিল, আকাশ থেকে পড়েই চলেছেন । ...মক্কেল, ভাড়াটে... পাঁচ হাজার টাকা... আইনানুগ ব্যবস্থা... বলপূর্ব্বক উচ্ছেদ... স্থানীয় শ্রদ্ধেয় সমাজসেবী... এসব কী !! এমনকী অফিসিয়াল ডকুমেন্টস পর্যন্ত আছে, নাকি ওদের !

অপুকে সদ্য বিবাহের পরে তাঁর বাড়িতে থাকতে দেওয়ার জন্য, এজাতীয় শব্দ সঞ্চালিত উকিলের চিঠি ইমেল মারফৎ তাঁর কাছে আসতে পারে, স্বপ্নেও ভাবেন নি সুদীপা । থম্ হয়ে বসেছিলেন বেশ কিছুক্ষণ । মাথা ঠিক কাজ করছিল না । তারপরেই কলকাতায় টেলিফোন করেছিল সুরূপাকে । কলকাতায় বিকেল তখন । রূপাকে পেয়ে গিয়েছিলেন ওর বাড়িতে ।

হ্যালো... রূপা... আমি দিদিভাই... ।

হ্যাঁ বুঝেছি... । ফোন করেছো কেন... আসার সব ঠিক আছে তো ?

হ্যাঁরে... সব তো ঠিকই আছে... মানে যা যা ঠিক করা ছিল... কিন্তু... ।

কী হয়েছে দিদিভাই... ?

গতকাল একটা ইমেল এসেছে... আজ পড়ে দেখলাম... কী যে সব মিথ্যে কথা লিখে পাঠিয়েছে -- কী বলব ।

সোনাদি... নাকি অপু... কে পাঠিয়েছে ?

না... ওদের তরফে একটা উকিল — দেবকান্ত মিশ্র ।

তাই নাকি ! একেবারে উকিলের চিঠি ! কয়েক মুহূর্ত চুপ হয়েছিল সুরূপা । তারপর বলেছিল, শোনো দিদিভাই, এরকম কিছু একটা হতে চলেছে... আমি আন্দাজ করছিলাম অনেকদিন থেকে । তোমাকে বলার চেষ্টা করেও পারিনি... কী করে পারব বলো !... তবে একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি... রজতদা চলে যাওয়ার পরে ওরা এবার কোনো রাখঢাক না করেই... । আবার থেমে গিয়েছিল সুরূপা ।

সুদীপা তখনই বলেছিলেন, আমি এখন কী করব বলতো তাহলে !

আলাদা করে কিছুই করবে না দিদিভাই । ক দিন পরেই তো আসছো ।

তাই তো কথা আছে... কিন্তু আমি উঠবো কোথায় গিয়ে ?

কেন ! মার কাছে... তিনতলায় উঠবে । এমনিতেও তুমি কি একা দোতালায় থাকতে? তাছাড়া আমার বাড়িও... ।

কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছে রে রূপা ! ওই একই বাড়িতে নীচেয় ওরা রয়েছে... ।

শোনো দিদিভাই মন শক্ত করো... আগে কলকাতায় এসে পৌঁছাও তারপর অন্য ব্যবস্থা করা যাবে... ।

জানি না... কী ব্যবস্থা করতে পারব... ।

পারতে হবে দিদিভাই... আগে এসো । এরমধ্যে তোমার ওদিকে সব ঠিকঠাক গুছিয়ে এসো... ।

সুদীপা বুঝতে পেরেছিলেন, রূপা এতোদূর থেকে টেলিফোনে ও বিষয়ে আর আলোচনা করতে চায় নি । লাভ নেই বুঝেই চায়নি । আর সত্যি তো, আলোচনার চেয়ে ব্যবস্থা গ্রহণই যুক্তিযুক্ত এখন । এবং সেটা বিদেশ থেকে করা সম্ভব না ।

একটা চাপা উদ্বেগ ভেতরে পুষে রেখেই দিনগুলো কাটিয়েছেন সুদীপা । কাজের ব্যস্ততাও কম ছিল না । যদিও ক্রিসমাস আর নতুন বছর আসার উন্মাদনায় কয়েকদিন অপেক্ষাকৃত ঢিলেমি এসেছিল সর্বত্র, তাহলেও, মোটামুটি নিজের আর্থিক সংগ্রহের ব্যাপারগুলো সেরে নিতে পেরেছেন । এরপরে বিনিয়োগের বিষয়ে ভাববেন, চেষ্টাচরিত্র করবেন । কিন্তু এখন তো তার আগেই আবার ঝামেলায় পড়লেন !

নিজের দিদি-জামাইবাবু, বোনপো... এরাই যদি... । তবু ভাল দেওর অরুনাভ ইদানীং মাঝেমধ্যে ফোন করে খবরাখবর নয় ।

নিজেকে নিয়ন্ত্রণে বাঁধলেন সুদীপা । সময় এগিয়ে চলেছে । মুনিয়া নিশ্চয়ই তৈরি হয়ে নিচ্ছে বেরুবে বলে । জিনিসপত্র গুছিয়ে দিতে হবে ওকে । কিন্তু তার আগে নিজের অনলাইন চেকইন-টা এবার করিয়ে নিতে হবে মেয়েকে দিয়ে... । উঠে

পড়লেন সুদীপা। টিকিট-পাসপোর্ট সব কম্প্যুটারের সামনে রেখে নিচেয় নেমে গেলেন সুদীপা। মুনিয়া বেরিয়ে গেলে তারপর নিজের ছোটখাট সব প্রস্তুতিগুলো সেরে নেবেন। কয়েকটা টেলিফোন করতে হবে... পাশের বাড়ির রুথ আর মাইকেল-এর সঙ্গে দেখা ক'রে আসতে হবে...।

(৬)

কলকাতায় এলে তাঁর জেটল্যাগ হয় না — সেটা আগেও খেয়াল করেছেন সুদীপা। এবারও হয়নি।

কিন্তু পৌঁছানর পরে প্রায় দুটো দিন লাগে সবকিছুর সঙ্গে নিজেকে মানানসই করে নিতে। দুটো দেশের মধ্যে সমস্ত দিক দিয়েই এতো তফাৎ যে, আবার সেই পুরনো অভ্যাসে ফিরে আসাটা খুব দ্রুত সম্ভব হয় না কিছুতে। অথচ সেই ব্যাপারে সোচ্চার হওয়াটা শোভন না একেবারেই। এক আধটা মন্তব্য করে ফেললেও... খারাপ লাগে নিজেরই।

মুস্কিল হচ্ছে, কিছু কিছু ব্যাপারে যেন অজান্তেই কথা বেরিয়ে যায়। শব্দ করে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়া, কিংবা হ্যাক-থু শব্দে জানালা দিয়ে থুথু ফেলা, জল পায়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসা, খাওয়ার পরে ঢেউ করে ঢেকুর তোলা, কথা বলতে বলতে ঘর কাঁপিয়ে হাঁচি কিংবা নির্দ্বিধায় সকলের সামনে বসে বসে, কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচানো... নাহ্,... সুদীপার সহ্য হয় না। মুখ ফস্কে কখনও দু-একটা কথা বলে ফেলেছেন... পরে বুঝেছেন, প্রতিক্রিয়া ভাল না।

বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকা সমগোত্রীয় মানুষকে কেউ কেউ এমনিতেই একটু নেক নজরে দেখে। তারওপর সমালোচনা করলে তো...। সে যাক।

কিন্তু রূপার আগ্রহে তার পরিচিত একজনের বাড়িতে সাঁইবাবার ভজন শুনতে যাওয়ার ইচ্ছা একেবারেই নেই সুদীপার । এবং তার পিছনে একটা নয়, একাধিক কারণ আছে। বোন অবশ্য র‍্যাশেনাল মেয়ে।

সুরূপা বলল, তোমার কি এখনও জেটল্যাগ রয়েছে দিদিভাই ?

জেটল্যাগ আমার কলকাতায় এলে এমনিতেও হয় না। সুদীপা বললেন। এখন তার ওপর তিনদিন কেটে গেছে।

তাহলে চলো না... খারাপ লাগবে না।

সুদীপা বললেন, আসলে এখন ও... কোনোকিছু ভাললাগার মতো সবটা তৈরি হয় নি রে !

সে আমি জানি... তাহলেও বেরুতে তো হবে...।

সুদীপা মাথা নাড়লেন। তা তো বটেই।

চা-এর কাপে চুমুক দিতে দিতে সুরূপা তাকায় দিদির দিকে। — তুমি কি ওইসব গানবাজনা.. হৈ চৈ এর জন্য.. এড়িয়ে যাচ্ছো ?

সেটা তো একটা কারণ বটেই। — হালকা হাসলেন সুদীপা। আগেও তো শুনেছি। বড্ড লাউড। বেসুরো আর যান্ত্রিক। জায়গাটা সন্তোষপুর বলেই কি আরও যেতে চাইছো না দিদিভাই ! যদি কোনোভাবে সোনাদিরা...।

না না... তা কেন ! সোনাদিরা থাকে বলেই আর জায়গাটা খারাপ না... গেছিও তো কতবার...।

সুরূপা কিছুই নাছোড়বান্দার মতো বলল, তাহলে আপণি কোরো না... তোমাকে নিয়ে যাওয়ার একটা উদ্দেশ্য আছে। ভুরু কুঁচকে তাকালেন সুদীপা। — কী বলতো ?

উমাদির বাড়িতে আজ সোনাদি-জামাইবাবু দুজনেই আসবেন... আমি চাই ওরা একটু দেখুক যে... তুমি মোটেই ভেঙ্গে পড়োনি...। তুমি এসেছো শুনে একবার দেখা পর্যন্ত করতে এলো না...। জানে তো সবই।

ডাক্তার মানুষ... দ্যাখ হয়তো সময় পাচ্ছে না।

তুমি এখনও ওই কথা বলবে দিদিভাই। আজকে সাঁইবাবার ভজনে যেতে পারছে.. অথচ তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিন দিনের মধ্যে একবার সময় হল না! রজতদা চলে গেছেন... সে খবরটার পরেও তো দেখা করতে আসা উচিত...।

সে তো নিচেরতলাতেই অপু আর ওর বউ রয়েছে... একবার ও তো আসে নি।

তাহলে বুঝে দ্যাখো। ছেলে-বউমার সঙ্গে সোনাদির তো নিত্য কথা হয় নিশ্চয়ই।

পরিস্থিতির বিচারে এরপরে যে ঠিক কী কথা বলা যায়, সুদীপা ভেবে পেলেন না। রূপা যা বলছে মিথ্যে না। কিন্তু বিগত চব্বিশ-পঁচিশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক কি সত্যি এতোটাই নিচেয় নেমে এসেছে! নাকি আর্থসামাজিক অবস্থা দিনে দিনে সম্পর্ককে এমন একটা জায়গায় দাঁড় করিয়েছে! কিংবা সোনাদিদেরই আড়ষ্ট সচেতনতা এটা!

না, পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটা ঠিক এভাবে বিচার করা যায় না। এটা নির্ভর করে ব্যক্তি মানসিকতার ওপর। এক শ্রেণির মানুষের লোভ বেড়ে গেছে চূড়ান্তভাবে, যার কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে সম্পর্ক, মানবিকতা। লোভ তাদের অমানুষ করে তুলেছে।

সুদীপার নীরবতার মধ্যেই সুরূপা বলল, যাকগে শোনো... আমি এখন চললাম... ওবেলা পাঁচটা নাগাদ আসবো... তৈরি থেকো।

তোমায় তুলে নিয়ে যাব। বাইরে বেরুনো দরকার।

সুদীপার মধ্যে যেন এখনও কিঞ্চিৎ বহিরাগত ভাব। বললেন, তুই কোথায় যাচ্ছিস এখন?

কোথায় মানে! বাড়িতে ফিরব। রাজ্যের সব কাজ তো পড়ে আছে।

চঞ্চল কোথায়?

ও বাড়িতে। আমি ফেরার পরে.. খাওয়াদাওয়া সেরে ও বেরুবে। একটু থেমে রূপা আবার যোগ করল, উইক এন্ডে গুড্ডু বাড়িতে আসবে... একটু রান্নাবান্না আছে। সেইজন্যই আমি নিজে এসেছিলাম আজ বাজার করতে। সেই ফাঁকে তোমার সঙ্গেও দেখাটা করে গেলাম ওবেলার কথাটাও বলে গেলাম। মা কে বলো... মার পুজো শেষ হওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করলাম না।

সুরূপার সঙ্গে সঙ্গে সুদীপাও উঠে পড়লেন। বললেন, আচ্ছা বলব... ঠিক আছে তুই আয়।

সিঁড়ির কাছে এগিয়ে সুরূপা বলল, আমার গাড়ি আছে দিদিভাই... চিন্তা কোরো না।

সুরূপা বেরিয়ে যাওয়ার পরেও কিছুক্ষণ সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন সুদীপা। প্রতিটি ফ্লোরের সঙ্গে সিঁড়িটা এমনভাবে যুক্ত যে, বাড়ির ভেতরের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। দরজা বন্ধ করে দিলে এক একটা তলা সম্পূর্ণ আলাদা। অমলেন্দু সম্ভবত ইচ্ছে করেই তিনটে ফ্লোর ওভাবে তৈরি করিয়েছিলেন। সুদীপা এখন যে তিনতলায় রয়েছেন, বাড়ির দলিল অনুযায়ী সেটি সুরূপার অংশ। কিন্তু প্রীতিলতা যতদিন আছেন, ততদিন তাঁরই বাসস্থান।

অপেক্ষাকৃত পুরনোদিনের বলেই এবাড়ির চেহারা কিঞ্চিৎ অন্যরকম। দশফুটের ওপর উচুঁ এক একটি তলা। পনেরশ স্কোয়ার ফুটের ওপর জায়গা হলেও মাত্র তিনখানা ঘর। রীতিমত চওড়া বারান্দা — যা আজকালের ফ্ল্যাটবাড়ির হিসেবে নেহাতই জায়গার অপচয়। পূব-দক্ষিণ অনেকটা খোলা। সামনের বারান্দা থেকে নিচের উঠোন ও দেখা যায়।

সুদীপা দেখতে পেলেন সুরূপা উঠোন পার হয়ে গেল।

একটি মাত্র ছেলে ওদের। গুড্ডু। দুর্গাপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। ফোর্থ ইয়ার। চঞ্চল নিজেও ইঞ্জিনিয়ার। তারাতলায় নিজস্ব স্মলটুল এর ব্যবসা আছে। সুদীপা জানেন উচ্চ মধ্যবিত্ত বলতে যা বোঝায়, সুদীপাদের অবস্থা সেরকমই বলা যায়। টালিগঞ্জ থানার পিছনে প্রতাপাদিত্য রোডে চঞ্চলদের পৈতৃক বাড়িতেই থাকে এরা। সে-ও পুরনোদিনের দোতালা বাড়ি। একতলায় নিঃসন্তান কাকা-কাকিমা এবং দোতালায় সুরূপাদের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। যাতায়াতের পথ আলাদা কিন্তু সুসম্পর্ক আছে।

মাঝেমাঝে মনে আসে সুদীপার, আশির দশকের শেষের দিকে বিলেত চলে না গেলেই কি তিনিও আজ সুরূপাদের মতো নিরুদ্বিগ্ন, শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করতে পারতেন না ! নিশ্চয়ই এ্যানেসথেসিষ্ট্ হিসেবে ভালই প্র্যাক্টিশ করতেন রজতাভ। হয়তো শ্রীরামপুর থেকে কবেই ফ্ল্যাট কিনে চলে আসতেন কলকাতায়।

কিছু না-হোক নিজেদের এই বাড়িও তো ছিলই। হয়তো বাবা বেঁচে থাকতেই তখন ওদের বলতেন লেক গার্ডেন্স-এ এসে থাকতে।

তাহলে আজকের এই জটিল পরিস্থিতি উদ্ভবেরও কোনো সম্ভাবনা ছিল না।

না, থাক। এজাতীয় নিস্ফলা অতীত চিন্তা করে কোনো লাভ নেই। বরং সোনাদি এবং অপুরা যোগসাজশ করে, সুদীপার অসুবিধে এবং বিপদের সুযোগ নিয়ে যে-বেকায়দায় ফেলেছে, তার থেকে উদ্ধারের পথ সন্ধান করাটাই হবে কাজের কাজ। কিন্তু কবে আর কিভাবে হবে সেই কাজ ! দেখতে দেখতে সুদীপার কলকাতা থাকার দিন ফুরিয়ে আসবে।

সকালের দিকে খানিকটা কুয়াশাচ্ছন্ন থাকার পরে এবার মাঝসকালের রোদ উঠেছে। তাসত্বেও ঠান্ডাভাব। সুদীপা বেশ বুঝতে পারেন, বিলেতের ঠান্ডার সঙ্গে কলকাতার এই ঠান্ডার অনেক তফাৎ। গায়ে একটা হালকা উলের চাদর রাখলেই মিঠে ঠান্ডাটা দিব্যি আরামের। আনোয়ার শাহ্ রোড থেকে খানিকটা ভেতরে ঢুকে আসার পরে এই বাড়ি; গাড়িঘোড়া যাতায়াতের শব্দ কম। বিক্ষিপ্ত বেশ কয়েকটা চারপাঁচ তলা ফ্ল্যাটবাড়ি উঠলেও, রাস্তার এধারটায় এখনও পাড়া-পাড়া ভাব আছে। বেশ কিছু বড় বড় গাছপালাও আছে। এ বাড়ির চত্বরের মধ্যেই কদম গাছটা এখন বিরাট হয়ে উঠেছে।

সুদীপার মনে আছে, মধ্যমগ্রাম-সোদপুরের দিক থেকে যখন শুধুমাত্র একতলা হওয়ার পরে এ বাড়িতে চলে এসেছিলেন বাবা-মায়ের সঙ্গে, তখন তাঁর আট বছর বয়স। সুতপা বারো-তেরো, আর সুরূপা মাত্র পাঁচ বছরের। এখন আর দেখলে বোঝা যাবে না, চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে কী শান্ত নিবিড় জঙ্গুলে ভাব ছিল, এসব দিকে। একটা মাত্র সরু ফিতের মতো রাস্তা, যাদবপুরের দিক থেকে গিয়ে মিশতো টালিগঞ্জের ট্রামরাস্তায় — সেটাই এই এখনকার ব্যস্ত প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড।

তখন ঘন্টায় একটা করে আশির বি-প্রাইভেট বাস যেত এই রাস্তা দিয়ে। দুপাশে রীতিমত জঙ্গলের মতো চেহারা। আনোয়ার শাহ রোডের দুপাশ থেকে গাছের ছায়া মন্দিরের মতো ঢেকে রাখতো পুরো রাস্তা। কয়েকটা দোকানপাট, রিকসাস্ট্যান্ড ছিল একমাত্র ঊষা ফ্যাক্টরির চওড়া গেট এর সামনে। গলফগ্রীনের দিকটা পুরো জঙ্গল। শিয়াল ডাকতো দিনের বেলা।

যোধপুর পার্ক গার্লস স্কুল তখন সদ্য শুরু হয়েছে। সোনাদির সঙ্গে সুদীপা স্কুলে যাতায়াত করতেন রিক্সা করে। এখন অতীতের কথা স্মরণ করে সুদীপার মনে হয়, সোনাদি বরাবর বুদ্ধিমতী, লেখাপড়ায় ভাল হওয়া সত্বেও, কোথাও যেন একটু হীনমন্যতায় ভুগতো। খুব সম্ভবত সেটা বোধহয় অন্য দুই বোনের তুলনায় সুতপার খটখটে শারীরিক গঠনের জন্যেই হবে। সুতপার গায়ের রং ময়লা, নাকচোখ মুখের মধ্যে নমনীয়তার অভাব ছিল। ওর ফিগারও মেয়েদের মতো সুডৌল না। অথচ এইসব অভাবগুলোই যেন আবার পরবর্তীকালে ডাক্তার হিসাবে বেশ কাজে লেগেছিল সুতপার প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে।

কিন্তু তা হলেই বা কী ! এখন সুদীপা বুঝতে পারেন, বরাবরের সেই চাপা হীনমন্যতাই যেন সোনাদির অবচেতন মনে অপর দুই বোন সম্পর্কে ঈর্ষার জন্ম দিয়ে চলেছে। নানান ব্যাপারে বরাবরই সুতপা যথাসম্ভব সুযোগ সুবিধা আদায় করে

নিয়েছেন বাবা অমলেন্দুর কাছ থেকে । এমনকী প্রবীরের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করার পরেও, সন্তোষপুরে জমি কেনা, বাড়ি করার ব্যাপারে অমলেন্দুকে শোষণ করেছে সুতপা ।

অথচ পারিবারিকভাবে কেউ, কোনোদিনই ওসব ব্যাপারে সোচ্চার হননি । প্রীতিলতা-অমলেন্দু জানতেও দেননি বাকি দুই বোনকে, যে, সুতপার জন্য কতবার কতরকমভাবে তাঁদের বিপদে পড়তে হয়েছে, ক্ষয়রাতি করতে হয়েছে । সুতপা যে বিয়ের আগে অন্তঃসত্বা হয়ে পড়েছিল, এবং তাই নিয়ে কী নিদারুণ টানাপোড়েনে পড়তে হয়েছিল অমলেন্দুকে, ভাসা ভাসা সেসব খবর সুদীপা-সুরূপা জানলেও, সোনাদি সম্পর্কে কোনরকম নেতিবাচক মনোভাব পুষে রাখে নি । বরং বাবা মায়ের শিক্ষায়, বড়দিদি হিসাবে চিরকালই সোনাদি-জামাইবাবুকে অন্যরকম শ্রদ্ধার চোখেই দেখে এসেছে । সুতপা প্রবীরও বরাবর সেই শ্রদ্ধার জায়গাটিকে সুযোগ হিসাবে চমৎকার ব্যবহার করেছেন — সুদীপা এখন বেশ বোঝেন ।

মনে আছে সুদীপার, বছর দশ-এগার আগে সোনাদিরা যখন বিলেত বেড়াতে গিয়েছিলেন, এবং সুদীপা- রজতাভর কাছে উঠেছিলেন, সত্যি কী দুরন্ত আনন্দে তখন সময় কাটিয়েছিলেন সুদীপারা । ছোটবাড়ি, ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়ে, রজতের হাসপাতাল... তাসত্বেও একা সুদীপা সংসারের সঙ্গে সঙ্গেই সোনাদি-জামাইবাবুকে মাথায় করে রেখেছিলেন স্বতঃস্পূর্ত উৎসাহে, আনন্দে । নিজেদের শোওয়ার ঘর ছেড়ে দিয়েছিলেন ওঁদের জন্য... ।

কিন্তু কী হল তারপরে ও !

রজতাভর মৃত্যু সংবাদ শুনে একটা টেলিফোন ও করেন নি সুতপা কিংবা প্রবীর । ...সুদীপা বুঝতে পারেন এখন, আসলে সেই তখনই ওর ফ্ল্যাটটিকে দখল করে নেওয়ার আদর্শ সুযোগ হিসাবে নির্বাচন করেন সুতপা । আগে আগে এমনিতেও সুতপা প্রচ্ছন্নভাবে ইংগিত দিতেন সুদীপাকে । মনোভাবটি যেন এইরকম-তোরা তো বিলেতে থাকিস, অনেক টাকা তোদের... এখানে পৈতৃক সম্পত্তির কী দরকার ! অধিকার ই বা কতটুকু... কেননা তোরা তো ওদেশের সিটিজেন... !

সেই মনোভাবেরই পরিণতি ওই উকিলের চিঠি... ওই ডাহা মিথ্যের ধারাবাহিক অভিযোগ । সত্যি... মানুষ এমন হয় !...

পুজো সেরে উঠে আসা প্রীতিলতার ডাক শুনে চমক ভাঙ্গল সুদীপার ।

ওমা... তুই একা এখানে দাঁড়িয়ে ! আর আমি ঘরে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছি !

মা'র কথা যেন কানেই গেল না সুদীপার । একটা আনমনা ঘোরের মধ্যে থেকে বললেন, মা, সোনাদি কি আমায় হিংসে করে ?

একটুও ভালবাসে না আমায় !

হাতে গঙ্গাজলের ছোট্ট ঘটিটা নিয়েই একটু দাঁড়ালেন প্রীতিলতা । শীতের দিন হলেও এই সকলের মধ্যে তাঁর স্নান সারা হয়েছে । জামাকাপড় পালটেছেন, সাদা উলের একটা বোতাম লাগানো ব্লাউজ ও পরেছেন । আশির কাছাকাছি বয়েস হলেও তাঁকে দেখলে বোঝা যায়, একসময় সুন্দরী ছিলেন এবং গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল ।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, কেন সকাল থেকে ওসব ভেবে ভেবে কষ্ট পাচ্ছিস !

তুমি আমার কথাটা এড়িয়ে যাচ্ছো মা... ।

তা নয় রে... এখনও আমার তুলসীকে জল দেওয়া হয় নি । কিন্তু তুই কেন শুধু শুধু... ।

প্রীতিলতাকে থামিয়ে দিয়ে সুদীপা বললেন, শুধু শুধু ! আমি মানুষটার ভেতরে কী ঘটে চলেছে... তোমরা বোঝো মা !

বুঝি... রে বুঝি... ।

তারপরেও বলছো শুধু শুধু... !

ওটা কথার কথা... মা। আচ্ছা দাঁড়া... আমি ছাদ থেকে ঘুরে আসি... ।

প্রীতিলতা যেন একটু রেহাই পেলেন মেয়ের সামনে থেকে সরে গিয়ে । এমনিতে ও প্রতিদিন সকালে স্নানের পর পুজোপাঠ শেষ করে, ছাদের ওপর তুলসী মঞ্চের ছোট চারাগাছটিতে জল দিয়ে প্রণাম করে আসেন। সুদীপা কলকাতায় এসে পৌঁছানর আগে থাকতেই একমাত্র তিনি বোধহয় মেয়েটির মনের অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছেন । আশির কাছাকাছি বয়েস হলেও, ভাবনাচিন্তা-অনুভূতি সমস্ত দিক দিয়েই তিনি যথেষ্ট সতর্ক এবং যুক্তিবাদী ও আধুনিক । আবার উদারতার দিক থেকেও তাঁর কোনো কারুরই কষ্টে বড় মনমরা হয়ে পড়েন প্রীতিলতা।

মা ছাদ থেকে ঘুরে আসার আগেই, বারান্দার শেষপ্রান্তে খাওয়ার টেবিলে গিয়ে বসলেন সুদীপা । কদিন ধরেই এই সময়টা যা হোক কিছু খেতে খেতে মা-মেয়ের বকর-বকর চলে। কাজের মহিলা কুসুম... বহু বছরে বাড়ির সদস্যা তো বটেই... হয়তো আরও বেশি কিছু । প্রীতিলতা এসে বলার পরে দুজনের জন্য কিছু ফল, সুজির হালুয়া আর মিষ্টি দিয়ে গেল টেবিলে।

সুদীপার দিকে তাকিয়ে বলে গেল, খেতে শুরু করো... চা দিচ্ছি। রুটি আর ফুলকপির ছেঁচকি করেছি।

বাটিতে দু চামচ সুজি তুলে নিতে নিতে প্রীতিলতা বললেন, শোন্ মা... তোরা তিন বোনই আমার কাছে এক।

একটা তিলের নাড়ু নিয়ে খুঁটছে সুদীপা। খাচ্ছেন না। বললেন, ছোটবেলা থেকে আমারাও তো তাই জানতাম মা।

কিন্তু কী করবি বল... সবাই তো একরকম হয় না !

আমার মাঝে মাঝে মনে হয় মা... সোনাদি যেন আমাকে আর রূপাকে নিজের বোন বলেই ভাবেই না।

আমিও ঠিক বুঝি না রে... হঠাৎ-হঠাৎ কখন যে ওর মাথায় কী ভূত চাপে... !

হঠাৎ নয় মা... আর ভূত চাপার মতো ব্যাপারও না... সোনাদি বরাবর রূপাকে আর আমাকে হিংসে করে এসেছে।

দুঃখীর মতো মাথা নাড়লেন প্রীতিলতা। বললেন, অথচ তার তো কোনো কারণ নেই.... তোর বাবা বরং তোদের দুই বোনের চেয়ে বরাবর তপুকেই একটু বেশি দেখেছেন... । বড় মেয়ে... একটু বেশি দেখতেই হয়... আমি কোনোদিন কিছু ভাবি নি... ।

আমরাও তো কোনোদিন ভাবিনি মা। মনেই আসে নি, তো ভাববো কি করে ! কিন্তু যত দিন যাচ্ছে...

আমি অনেক পরের দিকে একটু একটু করে বুঝেছি... কিন্তু তদ্দিনে তোরা সব যার যার নিজের জীবনে ঢুকে গেছিস। ছোটখাট বিষয় তখন আর মনে রাখি নি।

আর আমি তো দেশই ছেড়েছি... জীবনের অর্ধেকের বেশি... হতে চলল।

তপু প্রায়ই যাতায়াত করতো বাড়িতে... আমি সব ব্যাপার তো জানতাম না... তোর বাবা তখন ও বেঁচে। মাঝে মাঝে টের পেতাম কী সব আলোচনা নিয়ে একটু উত্তেজিত কথাবার্তা হয়... একবার তো এমনকী প্রবীরকেও প্রচন্ড ধমক দিয়েছিলেন তোর বাবা... মনে আছে বলেছিলেন, আমার মেয়েদের আমি তোমার থেকে ভাল চিনি.. রূপা আর দীপা কোনোদিন নিজের থেকে আমার কাছে কিছু চায় নি... আর তোমরা বড় হয়েও ওদের সম্পর্কে... ছি... ছি... ছি... ।

আমাদের সম্পর্কে কী খারাপ অভিযোগ করবে মা !

জানি না বাপু... আমার ও অতো কান দেওয়ার রুচি হয় নি। দুজনে ডাক্তার... টাকার অভাব নেই... তাও শ্বশুরের কাছে এসে নিত্য কাঁদুনি গাইছে... পরে বুঝেছিলাম, তপু-ই ঠেলে-ঠেলে জামাইকে পাঠাতো।

কি জন্য মা ?

পুরোটা তো জানি না। তোর বাবা-ও কোনোদিন ওসব ব্যাপারে আমাকে জড়াতে চাইতো না। হাবভাব আর অল্প কথায় টের পেতাম, তপু আর প্রবীররা এই পুরো বাড়িটা ভাড়ায়.. নাকি লিজ্ এ নিতে চাইছিল।

তাই নাকি ! কেন বলো তো ?

নার্সিংহোম করবে।

ওহ্... আমি তো এসবের কিছুই জানি না, শুনিও নি।

তোর বাবা ইচ্ছে করেই জানায় নি। কিন্তু ওদের বলে দিয়েছিল — ওসব ভাবনা মন থেকে তাড়াও। এতোকাল ধরে যা করার করেছি.. এবার কিছু করতে হলে নিজেরা করো।

তাইতো বোধহয় সোনাদি — জামাইবাবু খুব চটেছিল !

কী হয়েছিল জানি না। কিন্তু এরপরেই তোর বাবা উকিল-টুকিল ডেকে উইল করেছিল। নতুন দলিল হল। তিনটে ফ্লোর তোদের তিনজনের নামে লিখে দিয়েছিল।

চা-এর কাপে চুমুক দিয়ে সুদীপা বললেন, আচ্ছা একটা কথা বলো তো মা... এই বাড়ি তো তোমার নামে... প্রথম থেকেই...।

তাই তো। চিরকালই তাই আছে। প্রীতিভিলা।

তাহলে... বাবা কি করে সব.. আমাদের নামে উইল করে... দলিল করে... !

ওমা... নামে থাকা মানেই কি শুধু আমার... ! আমি তো কোনোদিনই কিছু করি নি... ওসব ব্যাপারে নাক গলাতেও যাই নি... যা তোর বাবা ভাল বুঝেছেন, করেছেন। আমারও তাইতে বিশ্বাস ছিল। কাগজ পত্রে যেখানে সই করতে বলতেন... করে দিতাম।

তার মানে... বাবার কথা বললেও... আসলে যা করার তুমিই করেছো।

সে তোমরা যেভাবে ভাবতে চাও, ভাবতে পারো। আমি জানি, তোর বাবা যা বুঝেছেন... তারপর আমার আর...। কয়েক মুহূর্তের নীরবতা রচিত হল। বারান্দায় রোদ পড়েছে... কদমগাছের ঝিলিমিলি ছায়া নড়ছে লাল দমঝেয়। উষ্ণ ভাব। সুদীপা বললেন, মা তুমি জানো... রজত মারা যাওয়ার পরে সোনাদি ফোন করেনি আমায়... !

শুনেছি। পরে বুঝতে পারলাম, কেন করেনি।

কেন বলো তো ?

তখনই তো ওরা কিভাবে দোতালাটা আটকে রাখবে... সেই প্ল্যান শুরু করেছিল।

নিজের দিদি বলেও না... মানুষ এরকম কি করে হয় মা ! আমার অতবড় বিপদের পরেই...।

কী বলব বল... ও... ও তো নিজের পেটের মেয়ে ! তবে... মানুষই এরকম হয়। চেহারায় মানুষ... আসলে...।

এরকম মানসিকতার মানুষ আবার ডাক্তার !

শোন দীপু... একটা কথা মনে রাখিস... তপুরা ছেলেকে দিয়ে তোর দোতালাটা দখল করিয়ে রেখেছে। ইচ্ছে করে, বুঝে শুনেই যা করবার করিয়েছে। তোর অবস্থাটা ওরা খুব ভালই জানে, বোঝে। কিন্তু তোরও দায়িত্ব আছে নিজের অধিকার ধরে রাখার... ।

জানি মা। কিন্তু রুচিতে কুলোচ্ছে না।

তোকে ঠেলে জলে ফেলে দিলে, হাত-পা না ছুঁড়ে উপায় আছে !

অপু'টাই বা কীরকম ছেলে বলো তো ! ও তো সব জানে... ।

যেমন বাপ মা... তার তেমন ছেলে ! তুই যে এসেছিস তাও জানে... কত বড় নির্লজ্জ যে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে ! আমার মনে হয় মা... একই বাড়িতে বসে, এরপরে সব আইনকানুনের টানাপোড়েন চলবে, সেটা ভাল দেখায় না।

আগে থাকতে এটা নিয়ে কোনো ডিসিশন নিস না দীপু... দু-একজনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তবে তোকে যখন উকিলের চিঠি পাঠিয়েছে... মনে হয় মুখের কথায় আর কিছু হবে না।

মনে মনে প্রীতিলতার বাস্তববুদ্ধির প্রশংসা করলেন সুদীপা। বয়েস হলেও ঠিক তাঁর মনের কথাটা উচ্চারণ করেছেন প্রীতিলতা। কয়েক দিন ধরে বেশ কয়েকজনের মুখ মনে পড়লেও, বিশ্বাসযোগ্য কার সঙ্গে যে এসব বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা করবেন, সে ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি।

প্রীতিলতার কথা শুনে বললেন, আমিও সেটা ভেবেছি মা। যাইহোক না কেন একটা উত্তর দিতে হবে। কিন্তু কার সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব... ।

সুদীপার কথার মধ্যেই প্রীতিলতা বললেন, আমার তো মনে হয় তোদের বন্ধু... সেই মাইতি... এসব কাজে তোকে সাহায্য করতে পারবে... আজ কালের মধ্যেই ও আসবে... তুই এসেছিস শুনেই দেখা করতে আসবে বলেছে।

আবারও অবাক হলেন সুদীপা। ঠিকই তো ! সুদীপা-রজতাভ দুজনেরই এতো বছরের পুরনো বন্ধু মাইতির কথা তো আরও অনেক আগেই মনে পড়া উচিত ছিল। এত বছর বিদেশে থাকলেও যে-কজনের সঙ্গে এখন ও যোগাযোগ আছে মাইতি অবশ্যই তাদের অন্যতম। প্রতি বছরই দেখা হয়। বাড়ি-ঘরের আভ্যন্তরীন কাজকর্ম করলেও, আসলে মাইতি করে না, এমন কাজ খুব কম আছে। সাধারণত এজাতীয় মানুষদের সুনাম-বদনাম দুইই থাকে। কিন্তু সুদীপাদের সঙ্গে সেই যে রজতাভর প্রথম জীবনে কোলাঘাটে চাকরির সূত্রে আলাপ এবং বন্ধুত্ব, তার মধ্যে কখনই আর কোনো প্রয়োজনের সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগ হয়নি। পারস্পরিক প্রীতির যোগাযোগটুকুই রয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মাইতির অবস্থার উন্নতি হয়েছে সুদীপারা-ও জানেন, কিন্তু সম্পর্কটা সেই আগের মতোই আছে।

রীতিমত উৎসাহিত হয়ে সুদীপা বললেন, ঠিক বলেছো তো মা ! এসব ব্যাপারে মাইতিই হচ্ছে ঠিক লোক... অথচ আমার একবারও মনে আসে নি... !

প্রীতিলতা বললেন, ঠিক-বেঠিক পরে বোঝা যাবে। তবে... এসব তো ওর লাইনের কাজ... তোদের এতোদিনের বন্ধু... রজতকেও নিজের দাদার মতো ভালবাসতো। সেইজন্যই মনে হল... ।

মা'র সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা বলে উঠে পড়লেন সুদীপা।

মাইতির নামটা শোনার পর থেকেই মনে মনে একটু যেন ব্যস্ততা অনুভূত হয়েছে। কাজটা আর ফেলে রাখা যাবে না। সোনাদি এবং অপুদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। ওরা অর্নিদিষ্ট কালের জন্য সুদীপার ফ্ল্যাট দখল করে রাখার মতলব করেছে অবশ্যই। বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছে তাঁকে। কিন্তু অত সহজে ছেড়েও দিতে পারবেন না সুদীপা। ওবেলা সোনাদির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা আছে। তা হোক। কিন্তু নিজেকে অন্যদিকে প্রস্তুতও হতে হবে। মাথায় বেশ কয়েকটা ভাবনা নিয়ে স্নান করতে চলে গেলেন সুদীপা।

(৮)

এখনও ছ-মাস হয়নি রজতাভ চলে গেছেন, অথচ এইটুকু সময়ের মধ্যে সুদীপার যা কিছু পরিবর্তন, (ভাবলেও) অবাক হয়ে যান প্রায়ই। শুধু বাইরের পরিস্থিতির তো না, পরিবর্তন ঘটে গেছে তাঁর ভিতরেও। মনে, ভাবনায়, মানসিকতায়। সব মানুষেরই জীবন-যাপনে, বিচার-বিবেচনায়, দর্শনে... কোথাও একটা বিশেষত্ব থাকে... একটা প্যাটার্ন থাকে। তাঁরও আছে। তাসত্বেও নিজেই অনুভব করেন, বিগত কয়েকমাসের মধ্যে অনেক ওলোটপালোট হয়ে গেছে সেইসব ব্যক্তিগত ধ্যানধারণার বিশেষত্বে।

শুধু কি রজতাভর চলে যাওয়ার জন্যই এতোসব পরিবর্তন... বদলে যাওয়া !

কোনো বিরল অবসরে নিজেই নিজেকে এই প্রশ্ন করেন সুদীপা।

ভেবে দেখেছেন, প্রাথমিকভাবে সেটাই কারণ হলেও.. তারপরের অভিজ্ঞতাগুলো অনেকটাই স্বোপার্জিত, ব্যক্তিগত। বোধ-বিশ্বাস-রুচি-সংস্কৃতি... সবই তো মানুষ আহরণ করে জীবনযাপনের অনুষঙ্গে। সেই যাপন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কম্পন অনুভূত হয় মানসিকতায়... তখন অভিজ্ঞতাও বুঝি অন্যমাত্রা পায়। মানুষটার মধ্যে নিঃশব্দে ওলোটপালোট হয়ে যায়।

জানুয়ারী মাস শেষ। ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহটি অতিক্রান্ত হতেই সুদীপার একক-জীবনযাপন... অথবা সাবেকি ভাষায় বৈধব্যজীবন ছ'মাসে পদার্পন করেছে। কয়েকটি দিন কেটে গেছে তারপরেও। অথচ মাত্র এই ছ'মাস কয়েক দিনের অভিজ্ঞতা যেন তাঁর অর্ধশতাব্দীর জীবনযাপনের নিরিখেও বৈচিত্র্যময়, নতুন, কখনও কৌতুহল-বিস্ময়-অস্বস্তির।

কিছুটা ইচ্ছে করেই ইতিমধ্যে দু-বার নিজের ঠিকানা পালটেছেন সুদীপা।

প্রথমে কিছুটা অস্বস্তি-আড়ষ্টতা থাকলেও, নিজেদের বাড়িতে, মা-র কাছেই উঠেছিলেন। রজতাভর মৃত্যুর পরে সেটাই ঠিক করা ছিল বিদেশ থেকে আসার আগে। কিছুটা প্রত্যাশিত ছিল অনেক বছর পরে একা আসছেন বলে। নয়তো প্রতিবারই দুজনে একসঙ্গে এসে, বিমানবন্দর থেকেই সোজা গিয়ে উঠতেন শ্রীরামপুরের শ্বশুরবাড়িতে, নিজেদের নির্দিষ্ট একতলায়। এবার প্রথম থেকে ভেবে রেখেছিলেন, মা-র সঙ্গে কয়েকদিন অতিবাহিত করে তারপর ফিরে যাবেন শ্বশুরালয়ের ঠিকানায়। যাই হোক না কেন, রজতাভ প্রয়াত হলেও, সুদীপা তো ওইবাড়িরই সদস্যা।

অস্বস্তি-আড়ষ্টতাটা ছিল অন্য কারণে।

মিথ্যাচার এবং চৌর্যবৃত্তির শয়তানি করে যারা সুদীপার ফ্ল্যাট দখল করে রয়েছে, ইমেল পাঠিয়েছে, সেই সোনাদির অকাল কুষ্মান্ড, শয়তান ছেলেটি এখানেই রয়েছে বউ নিয়ে। যদিও সুদীপা উঠবেন মায়ের কাছে, তিনতলায়, তাহলেও সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামায় যাতায়াতে অপু এবং ওর বউ রীতার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। এবং নিজের ঘনিষ্ট আত্মীয়র সঙ্গে ওই স্বল্পকালীন দেখা.. চোখাচোখি হয়ে যাওয়াটাও কি খুবই অস্বস্তির নয়। যদিও অবৈধভাবে বাড়ি দখল করে অবিশ্বাস আর নীরবতার পরিচয় দিয়েছে অপুরাই, তাহলেও সুদীপার অবস্থাটা যেন দাঁড়িয়েছিল... 'হাগুন্তির লাজ নেই, দেখুন্তির লাজে'র মতো। ভদ্রজনের দুর্বলতা যাকে বলে।

কিন্তু না, শেষ-পর্যন্ত মনের দূর্বলতাটা প্রশ্রয় দেন নি সুদীপা । রূপার সঙ্গে কথা বলার পরেই, বিশেষ করে, মনস্থির করেছিলেন নিজেদের ওই বাড়িতেই আগে উঠবেন । থাকবেন । কিছু আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার হলে তাও নেবেন এখান থেকেই । তার-পর যাবেন শ্রীরামপুর । গিয়ে থাকবেন । সত্যি বলতে কি, ওবাড়িতে গিয়ে থাকাটাও তো নিজেরই দায়িত্ব । রজতাভ নেই, কিন্তু সুদীপা তাঁর অর্ধাঙ্গিনী তো বটেই !

তাছাড়া দেওর অরুনাভর দিক থেকেও সুদীপার ওবাড়িতে গিয়ে থাকার ব্যাপারে আগ্রহ ও আন্তরিকতা ছিল যথেষ্ট । এমনকী বউদিকে আনার জন্য বিমানবন্দরেও পৌঁছে গিয়েছিলেন অরুণাভ । সুদীপা নিজের পরিস্থিতি এবং মানসিক অবস্থার কথা জানিয়েছিলেন সমবয়স্ক দেওরটিকে । অরুনাভ বুঝেছিল । একই সঙ্গে জানাতে ভোলেনি, বউদি, তোমার যেদিন, যখন মনে হবে... তখনই চলে আসবে... নয়তো আমাকে মোবাইলে ফোন কররে... তোমাকে এসে নিয়ে যাব ।

আবার ননদ জয়াও টেলিফোন করেছিল সুদীপাকে । তারও অনুরোধ বউদি যেন শ্রীরামপুরের বাড়িতে এসে থাকেন । হ্যাঁ, বাপের বাড়ি হলেও, জয়া তার স্বামী দীপক আর মেয়ে দেবযানীকে নিয়ে ওই বাড়িতেই থাকে । বাইপাস এর দিকে কোথাও ওদের ফ্ল্যাট আছে । কিন্তু কোনো কোম্পানিকে তা ভাড়া দিয়ে ওরা শ্রীরামপুরের বাড়িতে নিজেদের অংশে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । রজতাভদের পৈত্রিক বাড়িও দুইভাই এবং এক বোনের সম্পত্তি এখন । জয়া ফ্যামিলি নিয়ে থাকতেই পারে ।

সুদীপার মাথায় আসে, ও বাড়িতেও আবার কোনো জটিলতা নেই তো ! কেন আসে কে জানে ! ঘরপোড়া গরু বলেই কি ?

রজতাভর মৃত্যুর পরে পরেই সকন্যা জয়া ঘুরে এসেছে ইংল্যান্ডে । দাদার মৃত্যু-পরবর্তী সম্পর্কের টানেই জয়া বউদি এবং পরিবারের কাছে গিয়েছিল, বললেও, সুদীপা বুঝেছিলেন, মেয়েকে নিয়ে জয়া আসলে বেড়াতে এবং মেয়ের ভবিষ্যতের লেখা-পড়ার বিষয়ে কিছু খোঁজখবর নেওয়া — এই দুটি উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিল । দাদার বাড়ি ছিল ওদের ওঠার জায়গা । ঠেক । তো সে যাক । সুদীপা খুশিই হয়েছিলেন জয়া এবং দেবযানীর কিছুদিন থাকায় ।

কিন্তু কলকাতায় এসে এবার জয়ার কথাতে আন্তরিকতার সঙ্গেই যেন কিছু স্বার্থগন্ধী আলোচনার আভাস পেয়েছিলেন সুদীপা ।

সৌজন্যমূলক এবং খোঁজখবর নেওয়ার মতো দুচার কথার পরে জয়া বলেছিল, একা একা ওদেশে আর কেন পড়ে থাকবে বউদি !

সুদীপার অবাক লেগেছিল জয়ার কথা শুনে । কেননা, দাদার মৃত্যু পরবর্তী সময়ে বিলেতে থাকাকালীন জয়ারই মন্তব্য ছিল, উফ্ তোমাদের দেশটা এতো সুন্দর বউদি... আমি হলে... বছরে কয়েকটা সপ্তাহও কলকাতা গিয়ে নষ্ট করতাম না ।

সেই জয়াই এখন আবার উলটো গাইছে ! থাক, ওসব আলোচনায় না-যাওয়াই ভাল ।

কথার পিঠে কথা বলার মতো সুদীপা উত্তর দিয়েছিলেন, শেষপর্যন্ত কী করব এখনও তো জানি না !

চলে এসো বউদি । রজতদা নেই, কিন্তু আমরা তো আছি । একসঙ্গে জমিয়ে থাকবো ।

এসব যে নেহাৎ বাস্তব বহির্ভূত কথার-কথা সুদীপা জানেন । বললেন, আমার একার সিদ্ধান্তেই তো সব কিছু হবে না জয়া !

একটু অযাচিত চটুল রসিকতাও করল জয়া । বলল, এই দ্যাখো... এখন থেকেই দোকা তোমার পথ জুড়ে বসেছে ! সাহেবদের দেশ তো... !

সুদীপা পাত্তা দিলেন না। — তা যা বলেছো... এই অবস্থায় আবার দোকা... । আসলে তার চেয়েও বেশি.. ।

ওসব বললে কী হবে বউদি... ! তোমার এখনও যা চেহারা... যা দেখতে তোমায়... বড়দার কাজের দিনেও তো দেখছিলাম... ।

সুদীপার ভাল লাগছিল না। থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, বাদ দাও ওসব কথা।

জয়া ফিরে এসেছিল আগের কথায়। — তাহলে দেশে ফিরেই আসবে তো বউদি ?

ইচ্ছে তো করেই। কিন্তু ওদেশে পিছুটানও যে রয়েছে।

রবিন-মুনিয়ার কথা বলছো তো !

সে তো আছেই... ।

কিন্তু ওদের লাইফে তোমার কি কোনো রোল থাকবে বউদি ?

সেটা এখনও জানি না। কিন্তু তাছাড়াও আরও অনেক বাঁধন আছে জয়া।

জয়া খুব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, আসলে তোমার হাতে তো এখন অনেক টাকা... সেইসবের বিলিবন্টন, ব্যবস্থা করা... ।

সুদীপা আবার থামিয়ে দিয়ে বললেন, অনেক ব্যাপারটা খুব রিলেটিভ জয়া। তবে হ্যাঁ... আকস্মিক বিপদে আপদে ও দেশের সরকার পাশে দাঁড়ায়... তোমার বড়দা সরকারি কাজই করতেন... । টাকাপয়সা পাওনা তো হবেই।

তুমি তো উইডো-পেনশনও পাবে।

কথাটা ভাল না লাগলেও সুদীপা বললেন, পাবো। তোমার দাদা বেঁচে থাকলে যা পেতেন তার অর্ধেক... ।

সেটাই যদি এদেশের টাকায় ট্রান্সফার করো... ক্লাস ওয়ান গেজেটেড অফিসারও অত টাকা পেন্সন পায় না বউদি।

ওসব ভেবে দেখিনি।

তুমি চলে এসো বউদি... । আর একটা কথাও বলছি... শ্রীরামপুরে এসে থাকো।

তোমার ছোড়দাও সে কথা বলেছে... ইনফ্যাক্ট আমি আসার পরে ও এয়ারপোর্টেও গিয়েছিল... ।

আমি সবই জানি বউদি। তোমাদের কলকাতায় বাড়ি থাকলেও... এটাকে নেগলেকট্ কোরো না।

সে প্রশ্ন তো ওঠে না। এতোকাল তোমার বড়দার সঙ্গে প্রতিবছর তো শ্রীরামপুরেই উঠেছি... থেকেছি... ।

এবারই বা এলে না কেন ! আমরা অপেক্ষা করে বসেছিলাম।

আমাদের লেকগার্ডেন্সের বাড়ি নিয়ে একটু জটিলতা হয়েছে... সেই জন্যই আগে... ।

প্রপার্টি থাকলেই জটিলতা... বউদি... । এ বাড়িরও কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে... । বড়দা চলে গেল বলেই... ।

জটিলতার কথা ভাবছো কেন... ?

না না সেরকম কিছু না... দীপক বলছিল... তোমার এসে থাকার দরকার... কাগজপত্র ট্রান্সফার করাতে হবে তোমার নামে। ওর এখন হাওড়ায় পোস্টিং বলেই... দরকার হলে তোমাকে নিয়ে এখানে-সেখানে ঘোরাঘুরিটা করতে পারবে।...

আর কিছু না শুনেও সুদীপার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অনুমান করেছিল, শ্বশুরবাড়িতে যেন আসন্ন জটিলতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এদেশে নিজের ঘরবাড়ি-সম্পত্তি থাকলে এটাই যেন দস্তুর। জটিলতা-উদ্বেগ-আশংকা। যে প্রবাসী তার দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তা আরও বেশি, কেননা, তথাকথিত আপনজনেরাই তাকে ঠকানোর, পথে বসানোর চমৎকার কৌশল রচনা করে — তার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে।...

চার-পাঁচদিন আগে প্রায় বিনা নোটিসে সুদীপা গিয়ে হাজির হয়েছিলেন শ্রীরামপুরে, শ্বশুরবাড়িতে।

অথচ মাত্র গতকাল সকালেই আবার কলকাতা ফিরে এসেছেন। এসে উঠেছেন রূপার বাড়িতে, প্রতাপাদিত্য রোডে।

হয়তো আরও কয়েকটা দিন থাকতেন শ্রীরামপুরে। প্রাথমিকভাবে ভালও লাগছিল শ্বশুরবাড়িতে থাকতে।

তবু ফিরেই এলেন। আসার সিদ্ধান্তটা নিতে হল সম্পূর্ণ অন্যধরণের একটি ব্যক্তিগত কারণে। সুরূপা খুশি হয়েছে দিদিভাই এসে থাকায়। এমনিতেও কথা হচ্ছিল, লেকগার্ডেন্সের এই একই বাড়িতে থেকে আইন-আদালত করাটা মানতে পারছিলেন না সুদীপা। সুরূপা চেয়েছিল দিদিভাই ওর কাছে এসে থাকুক।

তাই রয়েছেন সুদীপা গতকাল থেকে। কিন্তু শ্রীরামপুর থেকে আকস্মিক ভাবে ফিরে আসার কারণটা অজানা ছিল সুরূপার কাছেও।...

দোতালার বারান্দায় রেলিং-এর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন সুদীপা। সুরূপার গলা পেয়ে চমক ভাঙ্গল। দিদিভাই কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে... চলে এসো।

একেবারে প্রতাপাদিত্য রোডের ওপরেই সাবেক কালের বড় বাড়ি চঞ্চলদের। রীতিমত ব্যস্ত রাস্তা এখন। বেলা বারোটা পর্যন্ত যানবাহনের গতি একমুখী। দক্ষিণ থেকে উত্তরে। বড় বড় গাছের ছায়ায় ঢাকা মাঝসকালের ব্যস্ত রাস্তা। জানুয়ারী মাস শেষ হওয়ার পর থেকে যেন কলকাতার হাওয়া ঘুরতে শুরু করেছে। সকাল-সন্ধেয় হিমেলভাব। কিন্তু তাপ বাড়ছে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। বসন্তের আকাশ মিশে যাচ্ছে প্রায়শই দিকপ্রান্ত বাতাসে।

সুদীপা টের পেলেন, শ্রীরামপুরের কথা ভাবতে ভাবতে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলেন। নিশ্চয়ই রূপা আগেও ডেকেছিল তাঁকে। কিন্তু কানে যায়নি। অস্বস্তি বোধ করলেন।

পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে, গলা উঁচু করে বললেন, আসছি... রূপা।

বারান্দার পিছনেই ঘর। তারপর কিছুটা দালান পেরিয়ে রূপাদের রান্নাঘর এবং ডাইনিং স্পেস। সুদীপা পৌঁছেই বুঝতে পারলেন, তাঁর দেরি দেখে চঞ্চল আর অপেক্ষা করতে পারেনি। ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ করে ঘরে চলে গেছে তৈরি হতে। সাধারণত ন'টার মধ্যে ও তারাতলা ফ্যাক্টরিতে চলে যায়। বাড়ির রাঁধুনি সন্ধ্যাকে কিছু নির্দেশ দিতে দিতে রূপা অপেক্ষা করছিল দিদির জন্য।

সুদীপা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, তুই আমায় আগেও ডেকেছিলি বোধহয় !

দিদির প্লেটে কুমড়োর ছক্কা আর লুচি তুলে দিতে দিতে সুরূপা বলল, একবার নয়... দুবার।

শুনতে পাইনি... গিয়ে ডাকবি তো...।

ইচ্ছে করেই ডাকি নি আর... মনে হল কিছু ভাবছিলে বোধহয়...।

এমন কিছু নয়... আসলে রাস্তার গাড়ির শব্দর জন্যই শুনতে পাই নি।

সুদীপার পছন্দের নলেনগুড়ের বাটি এগিয়ে দিল রূপা। দুই বোন খাচ্ছে। রূপা জিগ্যেস করল, শ্রীরামপুরে সব ঠিকঠাক আছে ? মোটামুটি। সংক্ষিপ্ত উত্তরের পরেও সুদীপা আবার যোগ করলেন, জয়েন্ট প্রপার্টি হলেই... সেখানে কিছু না কিছু মতবিরোধ, অশান্তি... এসব এড়ানো মুস্কিল।

ওখানেও তাই হচ্ছে ?

আভাস-ইংগিত পাচ্ছিলাম... তারপর তো চলেই এলাম।

হ্যাঁ... আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আরও কদিন থেকে আসবে শ্বশুরবাড়িতে... । অবশ্য আমাদের ভাল লাগছে তুমি চলে আসায়... চঞ্চল তো সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথাও বলছে... । এমনিতে ওসব মনে থাকে না। শ্রীরামপুর থেকে চলে আসার কারণ সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করলেন না সুদীপা। প্রসঙ্গ এড়িয়ে বললেন, একসঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাওয়াটা মিস্ হয়ে গেল... চঞ্চলের সঙ্গে কথাই হল না... !

আছো তো এখন। সুরূপা বলল। তুমি যে এখনও আনসেটলড রয়েছো তা বুঝতেই পারি... ।

কতটা সেটলড্ হতে পারবো... কে জানে ! সোনাদি আর অপুরা যে এরকমভাবে বিপদে ফেলবে... এতো স্বপ্নেও ভাবি নি ! সম্পত্তির লোভে রক্তের সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়, শুনেছি। গল্প-উপন্যাসে পড়েছি। কিন্তু নিজেদের জীবনে সেটা ঘটতে পারে... তাও আবার এমন একটা দিশাহারা সময়ে... ।

ওরা কিন্তু এগুলো খুব ক্যালকুলেটিভ ওয়েতেই করেছে দিদিভাই। রজতাভ মৃত্যুসংবাদ পেয়েই ইমেল পাঠিয়েছিল। তুই আমাকে আভাস দিতে চেয়েছিলি... আমি জানি। কিন্তু নিজেরই দিদি। এতো হার্টলেস হতে পারে ! কী জানো... গত মার্চ মাসেই তুমি যখন কিছু না ভেবে, এমনি-এমনি অপুদের থাকতে দিলে তোমার ফ্ল্যাটে, আমার কিন্তু মনটা কু-গাইছিল তখন থেকেই। কিন্তু কি করে সেকথা তোমায় বলব ! তুমিই বা কী ভাবতে আমায় !

আমারও তো একই অবস্থা। সোনাদি রিকোয়েষ্ট করছে... ছেলে থাকবে..., আমি কি না বলতে পারি !

আসলে কী জানো দিদিভাই... আমরা তো কলকাতায় থাকি, ঘরে-ঘরে মানুষের মধ্যে কী যে অবিশ্বাস, স্বার্থ নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি, নিত্য দেখছি। আর তার ঠিক পরেই হচ্ছে পোলিটিক্যাল ইনভলবমেন্ট, আইন আদালত। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ খেয়ে গেলেন সুদীপা। মাথা ঝাঁকালেন আস্তে আস্তে।

তারপর, বললেন, কেন বল তো এমন অবস্থ্যা ? সোনাদি-দের কি কোনো অভাব আছে।

লোভ দিদিভাই... লোভ। আর বিদেশে থাকো বলে তোমাকে বিপদে ফেলাই তো সব থেকে সোজা। তাছাড়া আর একটা ব্যাপারও আমি জানি। সোনাদি... বিশেষ করে তোমাকে, মনে মনে খুব হিংসে করে... দুজনে ডাক্তার হয়েও বিলেত যেতে পারে নি.. হয়তো অনেক পয়সা আছে... কিন্তু কোয়ালিটি অব লাইফ বলে তো কিছু নেই.. আর জামাইবাবু তো নামেই ডাক্তার। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করেছে শেয়ারে খাটিয়ে। আর ছেলেও... নামে ইঞ্জিনিয়র, আসলে অপোগন্ড, হিপোক্রিট... ।

অথচ দ্যাখ, সেদিন তোর বন্ধুর বাড়িতে সাঁইবাবার ভজনে দেখা হ'তে... সোনাদি কেমন হেসে হেসে কথা বলল... ।

ও সবই হচ্ছে শয়তানি আর ন্যাকামি দিদিভাই... । অপুরা যা কিছু করেছে, সবই সোনাদির সমর্থনে আর পরামর্শে... অথচ তোমার সামনে সোনাদি এমন ভাব করল... যেন কিছু জানেই না... ! এমনকী তোমার দুঃখে কত কাতর !

দিন দশ আগে, সুরূপাই সুদীপাকে নিয়ে গিয়েছিল সন্তোষপুরে বন্ধুর বাড়ি। সাঁইবাবার ভজন উপলক্ষ্যে যাওয়া হলেও, সুরূপার আসল উদ্দেশ্য ছিল — যাতে সুতপা তথা সোনাদির সঙ্গে সুদীপার সামনাসামনি একবার দেখা হয়ে যায়। ও দেখতে চেয়েছিল, আপন বোনের চূড়ান্ত সর্বনাশ করেও সামনাসামনি সোনাদি কেমন নাটক করে। সত্যিই তাই। সুদীপাকে প্রতিবেশির বাড়িতে দেখেই সুতপা এমন একটা ভাব করেছিলেন, যেন বোনের কষ্টে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে। উদয়াস্ত রুগিদের ভিড় আর কাজের চাপে তিনি নাকি একটা খোঁজ পর্যন্ত নিতে পারেন নি রজতাভর মৃত্যুর পরে — সেটার জন্য কী যে অন্যায়বোধ তাঁকে কুরে কুরে খেয়েছে... !

একথা অবশ্য একবারও উত্থাপন করেননি — সুদীপার ফ্লাটটি তাঁরা মেরে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ল ইয়ারকে দিয়ে ইমেল পাঠিয়ে, ছেলে আর বউমাকে ভাড়াটে বানিয়ে দিয়েছে বোনের বাড়ির।

সুদীপা একটু পরে বললেন, অথচ ওরা যদি আরও কিছুদিন আমার ফ্ল্যাটে থাকতে চাইতো...।

সুরূপা থামিয়ে দিয়ে বলল, শোনো দিদিভাই, ওঁদের ধান্ধাটা তুমি বুঝতে পারছো না ! ? ফলস্ কাগজপত্র ক'রে ওরা পাকাপাকি-ভাবে ওখানে থেকে যাওয়ার মতলব করেছে। তোমাকে আইন আদালতে টেনে নিয়ে যাবে... তারপর কোর্টে ঘুষ খাইয়ে খাইয়ে বছরের পর বছর কেস চালিয়ে যাবে... তারপর জানে, একসময় তুমি হাল ছেড়ে দেবে।

আমার তো এখনই হাল ছাড়ার অবস্থা রে...।

নানা... দিদিভাই... ওরকম নেগেটিভ এ্যাটিচ্যুড রেখো না তো...। তোমাদের বন্ধু ওই মাইতিদা খুব একসপার্ট লোক শুনেছি... প্রচুর ঘাঁত ঘোঁত জানে... দ্যাখো ঠিক একটা রাস্তা বার করবে...।

কিন্তু আমার রুচিতে কুলোচ্ছে না রূপা...।

জানি তো। কিন্তু ওরা যদি তোমাকে টেনে নামায়... কী করবে ! আজ ওবেলা তো মাইতিদা আসবে এখানে। আলোচনা করো, কথা বলে দ্যাখো। এমনি-এমনি ওই শয়তান, চামারগুলোকে ছেড়ে দেবে... !

সুদীপা স্বগতোক্তি করার মতো বললেন, কাদের বিরুদ্ধে স্টেপ নেব... ওপরদিকে মুখ করে থুথু ফেললে... সে তো নিজের গায়েই পড়ে। সুরূপা টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, ভগবান বলে কিছু নেই দিদিভাই... তুমি যদি ছেড়ে দাও, দেখবে ওই নচ্ছোরগুলো বহাল তবিয়তে আছে। শয়তানেরই যেন মনে হয় ভগবান সহায়। কিছুতেই ছাড়া চলবে না।

জলখাবার আর কফি শেষ করে উঠে পড়লেন সুদীপা। স্নান করতে যাবেন।

পনের দিনের বেশি হয়ে গেছে কলকাতায় এসেছেন, অথচ আসার আগেই যে বিপদের বোঝা ঘাড়ে চেপে বসেছিল, দিনেদিনে একটু একটু করে বুঝতে পারছেন, খুব সহজে তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। মামলা-মোকদ্দমা সম্পর্কে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতা নেই, অথচ বাড়ি উদ্ধার করতে গেলে তার মধ্যে ঢুকতেই হবে। এবং একবার ঢুকলে, কবে বেরুতে পারবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কেননা টাকার বিনিময়ে রক্ষকরা দ্রুত ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সুতরাং যার ওপর নির্ভর করে কাজে অগ্রসর হবেন, সে অথবা তিনি কতখানি বিশ্বাসযোগ্য, সেই সন্দেহ থেকে রেহাই নেই।

অথচ মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো 'পাপ'— এই আপ্তবাক্য তারপরেও স্মরণীয় !

সম্প্রতি আর একটি অভিজ্ঞতাতেও রীতিমত বিভ্রান্ত এবং বিচলিত বোধ করেছেন সুদীপা। যে কারণে কিছুটা অপ্রস্তুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে শ্বশুরবাড়ি শ্রীরামপুর থেকে ফিরে এসেছেন রূপার কাছে।

জয়ার স্বামী নন্দাই দীপকের আচরণে দুদিন আগে একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন সুদীপা।

দীপক অধ্যাপক মানুষ, সজ্জন, বয়েসেও তাঁর কাছাকাছি হবে বলেই অনুমান সুদীপার। জয়ার বিয়ে হওয়ার পর থেকেই দেখে আসছেন। সাত-আট বছর আগে ওরা শ্রীরামপুরে চলে আসার পর থেকে প্রতি বছরই শীতের সময় দেখা হয়। আড্ডা এবং একসঙ্গে আরও অনেককে নিয়ে পিকনিক-এ যাওয়া প্রায় রুটিনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। জমজমাট সময় কাটতো।

স্বাভাবিক ভাবেই এ বছর সুদীপার আর সেই আনন্দ করার মানসিকতা ছিল না।

শ্রীরামপুরের বাড়ির একতলাটি রজতাভর । অপেক্ষাকৃত বড় এবং প্রশস্ত দোতালাটির একদিকে জয়া এবং অপরদিকে অরুনাভর অংশ । নতুন সিঁড়ির ব্যবস্থায় দুই পরিবারের আলাদা যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে । আবার যোগাযোগ রাখার ব্যবস্থাও আছে । মাত্র কয়েকদিনের জন্য এসে সুদীপার আলাদা রান্নার ব্যবস্থা ছিল না এবার । দিনের বেলা দেওয়ের কাছে এবং রাতে ননদের কাছে খাওয়াদাওয়ার অলিখিত আয়োজন হয়ে গিয়েছিল ।

সেদিন জয়া ছিল না । স্কুলের ছাত্রীদের সঙ্গে মেয়েকেও নিয়ে একদিনের জন্য শান্তিনিকেতনে গিয়েছিল । সুদীপারও যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল । শেষ মুহূর্তে ভাল না লাগায় বাতিল করেছিলেন ।

যথারীতি দীপকের সঙ্গে নানান গল্প কথাবার্তার মধ্যেই খাওয়াদাওয়া সেরে নীচে চলে আসার উদ্যোগ করছিলেন সুদীপা । হাতে লবঙ্গ দিয়েই দীপক অনুরোধ করেছিল আর একটু বসার জন্য । রাত হয়েছিল... সুদীপা চাইছিলেন না আর থাকার জন্য । কাবার্ড থেকে পছন্দের একটি বই নিয়ে, পিছনে ঘুরতেই দেখেন একেবারে গায়ের কাছে দীপক ।

পাশ কাটিয়ে সরেই আসছিলেন । হঠাৎই লম্বা চওড়া দীপকের দু-হাত সুদীপার কোমর বেড় দিয়ে ধরল । মুহূর্তেই সুদীপা টের পেলেন, দীপকের গায়ে আগুন ছুটছে । এবং কামার্ত কণ্ঠে দীপক বলছে, না সুদীপা... প্লিজ যেও না... থাকো, আর একটু থাকো... । বিভ্রান্ত অবাক — দিশাহারা সুদীপা । দীপকের মতো মানুষের এই আচরণ তাঁর কল্পনাতীত । আবার সম্পর্কে নন্দাই ।

স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াতেই মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়েছে, এ... কী... একি করছো দীপক... ছাড়ো... প্লিজ ছাড়ো বলছি... ! ততক্ষণে দীপক দুই হাতের টানে সুদীপাকে প্রায় মিশিয়ে নিয়েছে নিজের তপ্ত শরীর, মুখ ঘসছে ওর কাঁধে-গলায়-গালে । এদিকে নিজেকে সরানর চেষ্টার করেও বন্দী সুদীপা । মুখ সরাচ্ছে এপাশ-ওপাশ এবং বলে যাচ্ছে — না — না দীপক ছাড়ো... তুমি জানো না তুমি কী করছো... প্লিজ বিহেভ ইয়োরসেলফ... ।

দীপক গোঙানোর মতো বলল, আমি তোমায় কিছুতেই ছাড়বো না সুদীপা... প্লিজ তুমি আমাকে ভুল বুঝো না... আমি বহুদিন থেকে তোমার জন্য কাতর... আই লাভ য়্যু সুদীপা... আই হেট জয়া... তুমি সরিয়ে দিও না আমায়... তুমি আমার কাছে থাকবে এবার থেকে... তোমার সঙ্গে আমি আবার...

সুদীপা প্রাণপনে দীপককে ঠেলে সরানর চেষ্টা করলেন । কিন্তু পারলেন না । ততক্ষণে দীপকের নেমে আসা মুখের আগ্রাসী চুম্বনে ও নির্বাক । বুঝতে পারছেন, দীপকের হাত ওঁর শরীরের স্পর্শকাতর স্থানে সক্রিয় হয়ে উঠছে দ্রুত । নিজেকে শেষ মুহূর্তে বাঁচানর জন্যই সুদীপা হাতের বই দিয়ে সজোরে দেরাজে আঘাত করলেন, এবং সেই শব্দেই মুখ সরাল দীপক । আর তখনই সুদীপা তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, আমি কিন্তু চেঁচিয়ে অরুনাভকে ডাকবো দীপক... ছাড়ো ছাড়ো বলছি... । হঠাৎই যেন সম্বিত ফিরল দীপকের । শিথিল হয়ে গেল হাতের বন্ধন । বলল, প্লিজ সুদীপা... আমায় ভুল বুঝো না... যা বলেছি... তা মিথ্যে না... কিন্তু সরি... হঠাৎ এভাবে তোমাকে আমার... আয়াম রিয়্যালি সরি... কিন্তু তুমি যেও না... ।

সুদীপা আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করেন নি । দ্রুত নিজেকে সাব্যস্ত করে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন একতলায় । বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ঘুম আসে নি । মনের মধ্যে টানাপোড়েন — কাকে বলবেন এই ঘটনার কথা ! মানুষের মন... বললেও.. যে শুনবে সে বিশ্বাস করবে তো সুদীপাকে ! স্থির করেছিলেন, জয়ারা শান্তিনিকেতন থেকে ফেরার আগেই পরেরদিন সকালে কলকাতায় ফিরে যাবেন এবং নিজেদের বাড়িতে না, উঠবেন রূপার কাছে, প্রতাপাদিত্য রোডে । সকালবেলা চা-খাওয়ার সময়ই অরুনাভ এবং জা চন্দ্রাকে জানাবেন — কাজ পড়ে গেছে কলকাতায়.. যেতে হবে... । তারপর... ।

আবারও রূপার গলা শুনে একটা ঝাঁকানি খেলেন সুদীপা ।

কী হল দিদিভাই... স্নান করতে গেলে না । আমি তো কখন গীজার অন করে দিয়েছি... !

বারান্দার দিকে নিজের থাকার ঘর থেকে উত্তর দিলেন সুদীপা। — ওহ্ — হ্যাঁ — হ্যাঁ... সরি... এই যাচ্ছি রে। আসলে স্নানে যাওয়ার জন্য আদৌ তৈরি হন নি সুদীপা। ঘরের দেয়ালে একটা পারিবারিক ছবি দেখতে দেখতেই আবার আনমনা হয়ে গিয়েছিলেন। দীপকের নিপাট ভাল মানুষের মতো চেহারাটা — ধুতি পাঞ্জাবি পরা, চোখে চশমা, দেখে কি সত্যি বোঝার উপায় আছে... সুযোগ পেলে এই লোকটাও প্রায় ধর্ষণকারী হয়ে উঠতে পারে ! নাকি শুধু দীপক বলে নয়... পুরুষ মাত্রই সুযোগমতো একটি মহিলাকে পেলে, তাকে লোভনীয় খাদ্য ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না !

সুদীপা সচেতন হলেন ! রুপা এসে হাজির হয়েছে দোরগোড়ায়। চোখে মুখে অনুসন্ধিৎসা।

দিদিভাই... কী হয়েছে তুমি আমায় একটু বলবে প্লিজ !

জামাকাপড়, তোয়ালে নিতে নিতে এড়াবার চেষ্টা করলেন সুদীপা। — কিছু না... নতুন করে কী আর হবে ?

কিছু একটা হয়েছে... তুমি এড়িয়ে যাচ্ছো...।

ওরে না...। আমার অবস্থাটা ভেবে দ্যাখ... সেইসঙ্গে মাথার ওপর কতগুলো ঝামেলা...।

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, একটা নতুন কিছু ব্যাপার হয়েছে... সেটি তোমার শ্বশুরবাড়িতে... ঠিক বলছি ?

কেন তোর সেরকম মনে হচ্ছে বল তো ?

ওটা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিদিভাই।... অবশ্য বলতে না চাইলে... বোলো না। জোর করব না।

ধ্যুৎ পাগল... তোর কাছে আবার লুকোনর কিছু আছে নাকি... !

একটু একটু করে গম্ভীর হয়ে উঠলেন সুদীপা। বসে পড়লেন উঁচু খাটের কোনায়। তারপর হাতের তোয়ালে, জামাকাপড়গুলো মুখের কাছে তুলে ধরতে-ধরতেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললেন। কিন্তু চেষ্টাও করলেন নিয়ন্ত্রণ রাখার।

সুরূপা দ্রুত পাশে বসে জড়িয়ে ধরল সুদীপাকে। কী হয়েছে দিদিভাই... বলো... আমাকে বলো...।

নিজেকে আর চেপে রাখতে পারলেন না সুদীপা। একটু সামলে নিয়ে উজাড় করে দিলেন বোনের কাছে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক **নবকুমার বসু** ইংল্যান্ডের বাসিন্দা। ''চিরসখা'' সহ অনেক জনপ্রিয় উপন্যাস তিনি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। প্রতিভাস প্রকাশিত 'তোমার আঁধার তোমার আলো' তাঁর নবতম উপহার, গত বইমেলায় প্রকাশিত। 'হটাবাহার' তাঁর প্রথম অন্ লাইন ধারাবাহিক উপন্যাস, তিনি বাতায়নের হাতে তুলে দিয়েছেন।

স্মৃতিকথা

সিদ্ধার্থ দে

সুনীল সাগরে

পর্ব ৪

(১৩)

সুনীলেকে নিয়ে কোন লেখা কবিতা বাদ দিয়ে কি সম্ভব? কবিতাপ্রেমী সুনীলভক্তরা একবাক্যে বলবেন "না"। কিন্তু মিথ্যে বলব না – সেরকম ভাবে কবিতার রসাস্বাদন করতে কোনওদিনই পারি নি আমি। স্কুলের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত কবিতা ছাড়া স্রেফ কবিতা পড়ার জন্য কবিতার বই খুলে বড় একটা বসিনি। সুনীলের কবিতাও বিশেষ পড়িনি । কোন গর্বের কথা নয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসৃষ্টির সিংহভাগও আমার না পড়া। বাবা একটা কথা প্রায়ই ব্যবহার করতেন রসকসহীন মানুষদের প্রসঙ্গে – "গদ্যময়"। আমি সেই প্রকৃতির বটে কবিতার ক্ষেত্রে। তবে ভাল আবৃত্তি শুনতে বেশ লাগে। নিজের পড়ায় যেটা অন্তরে পৌঁছয় না আবৃত্তির গুণে অনেক কবিতা কোন জাদুতে যেন হৃদয় ছুঁয়ে যায়। ঘরোয়া আসর আর সাহিত্য সন্ধ্যা দুটি অনুষ্ঠানেই সুনীলকে আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল। সুনীলের সোজাসাপটা উত্তর ভাল না লাগলে কবিতা পড়ার দরকার কি ? কে মাথার দিব্যি দিয়েছে? কথাটা আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। কবিতা সাহিত্যের একটা মবহৎব বা ধারা মাত্র। সবার সব ধারা তো ভাল না-ও লাগতে পারে।

তবে আজকের ফেসবুক আর WhatsApp-এর জমানায় সুনীলের কবিতা এড়ানো মুশকিল। কিছু কবিতা কোন চোরাগলি দিয়ে ঢুকে মনের কোণে জায়গা করে নেয়। বনলতা সেনের মত নীরা, নাদের আলীরা বাংলা কবিতার আইকন হয়ে গেছেন। সুনীল সন্ধ্যায় কবি নিজে তিন চারটি কবিতা পাঠ করেছিলেন। মনে আছে একটি ছিল "যদি নির্বাসন দাও"। কবিতা ভাল না বাসলেও সুনীলদার সেই মাথা ঝাঁকিয়ে বলা আবৃত্তিটা আজও কানে ভাসে :

"যদি নির্বাসন দাও, আমি ওষ্ঠে অঙ্গুরী ছোঁয়াব

আমি বিষপান করে মরে যাবো ।"

আমি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ – দেশভাগের যন্ত্রণার, দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হয়নি। এই মুহূর্তে নিজের ইচ্ছেতেই প্রবাসী। তবে যখন প্রাণ চায় একছুটে দেশে যেতে পারি, মাঝে শুধু ভারত মহাসাগর নামে পুকুরটা। যদি সেটা না হত? যদি ফেরার রাস্তাটাতে "প্রবেশ নিষেধ" লেখা থাকত? দু একবার দুঃস্বপ্নে এই পরিস্হিতির মুখোমুখি হয়েছি। ঘুম ভেঙে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে ভেবেছি "ভাগ্যিস !"। স্বাতীদিও একটি কবিতা পড়েছিলেন। ক্যানবেরার অন্যান্য মানুষজনের সঙ্গে চন্দনাও একটি কবিতা বলেছিল। সুনীলদা প্রশংসা করেছিলেন অনুষ্ঠানের পর। কিন্তু উচ্চারণ নিয়ে মৃদু বকুনিও দিয়েছিলেন। কবিতাটিতে একটি কথা ছিল "ফুলচোর"। চন্দনা উচ্চারণ করেছিল ফুল চোর। সুনীলদা শুধরে দিয়েছিলেনু ওটা হবে ফুলোচোর। যেমন আমাদের শ্যামবাজার পাড়ার সিনেমা হল রূপবাণীর সঠিক উচ্চারণ "রূপোবাণী"। ব্যকরণগত নিয়মটাও বলেছিলেন – সেটা আর মনে নেই। ৭০-এর দশকে কলকাতার বেথুন স্কুলে পড়ার সময়ে চন্দনা কয়েক ক্লাস নীচে পড়া ব্রততী নামে এক ছাত্রীর সঙ্গে নানা জায়গায় আবৃত্তি করে বেড়াত। শুনি ব্রততী নাকি ইদানিং খুব নাম করেছেন আবৃত্তির জগতে। আমার মত একটি চালচুলোহীন কবিতার প্রতি উদাসীন মানুষকে ভালবেসে পরবর্তী জীবনে চন্দনার আর সেরকম ভাবে কবিতা বলা হয়নি। তবু মাঝে মাঝে মুড এলে কবিতা বলে। আলো কমিয়ে দিয়ে মন দিয়ে শুনি। সেদিন সুনীলের "তস্য গলি" নামে সুনীলের একটি কবিতা পড়ছিল। অজান্তেই উত্তর কলকাতার কোন চেনা গলিতে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

(আমার ব্লগ সাইটে "চন্দনার কবিতা" নামে একটি সংকলনে "তস্য গলি" কবিতাটির লিঙ্ক আছে)

সুনীলের অস্ট্রেলিয়া সফর উপলক্ষে "আনন্দধারা"র উদ্যোগে কবির সম্পাদনায় "দখিনা" নামে (নামটির উৎস অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ গোলার্ধে ভৌগলিক অবস্হানে) একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার কয়েকটি পাতা লেখার এই অংশে তুলে দিলাম। সুনীলের অপ্রকাশিত একটি কবিতাও ছিল এই সংকলনটিতে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সম্প্রতি কবি শ্রীজাত-র সফরেও শ্রীজাত সম্পাদিত "দখিনা"র আর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

(১৪)

তুই লাল পাহাড়ের দেশে যা,
রাঙা মাটির দেশে যা,
ইখানে তোকে মানাইছে না গ,
ইক্কেবারে মানাইছে না গ।

"পূর্ব পশ্চিম" গ্রন্থের কোন এক অধ্যায়ে সুনীল এই গানটির উল্লেখ করেছিলেন। সম্ভবত সিচুয়েশন না এইরকম ছিল: আমেরিকার কোন এক জমায়েতে এক ভারতীয় তরুণ গিটার বাজিয়ে এই গানটি গাইছে। আমার interpretation হল পশ্চিমী দেশে ভারতীয়দের বেমানান অবস্হার প্রতি ইঙ্গিত করেই সুনীল এই গানটিকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সেই জন্যই বোধহয় তিনি সুযোগ থাকা সত্তেও আমেরিকা বাস প্রত্যাখ্যান করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ভাগ্যিস এটা ঘটেছিল!

সুনীলদার গায়ক সত্তাটা কিন্তু আমার অজানা ছিল। আমাদের সান্ধ্য অনুষ্ঠানে এই গানটি উনি খালি গলায় গেয়েছিলেন। মিথ্যে বলব না, গলা মোটেও সুরেলা লাগেনি আমার। কিন্তু আসর জমে গিয়েছিল। হাজার হোক, যিনি গাইছেন তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ! তুলনা হিসাবে বলা যেতে পারে শীতকালে পিকনিকে যাওয়ার বা ফেরার পথের দল বেঁধে গানের কথা। সেখানে কেউ সুরের তোয়াক্কা করেনা, মেজাজ বা উচ্ছ্বাসটাই আসল। সুনীলদার গলায় সেই উচ্ছ্বাসটাই পেয়েছিলাম, যা সুরের, তালের, লয়ের অভাব বেমালুম ঘুচিয়ে দিয়েছিল।

এই গানটি ছাড়া সান্ধ্য আসরে উনি আর একটি গান গেয়েছিলেন – কথা মনে নেই তবে কোন মজার ব্যাপার নিয়ে লেখা এটুকু মনে পড়ছে।

একদিন দুপুরে ডুঙ্গাকে স্কুল থেকে তুলে আমরা একটু গাড়িতে ক্যানবেরা শহর চক্কর মারব বলে বেরিয়েছি। চন্দনা বাচ্চাদের একটা ছড়ার গান "ইন্দি বিন্দি সিন্দি, উঁকি মারে গাছের আড়াল থেকে" শিখিয়েছিল। দুজনের কেউ একটা গানটা শুরু করেছিল যেতে যেতে। গলা মেলালেন সুনীলদা! অদ্ভুত একটা মজা লাগছিল। বিশ্বাসই হচ্ছিল না অস্ট্রেলিয়াতে সুনীলদা আমার সন্তানদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান ধরেছেন! ওঁরা আসার আগে, সচেতন ভাবে বেশ কিছু scenario কল্পনা করেছিলাম, কিন্তু আমার radar-এ এই দৃশ্যটি একেবারেই ছিল না।

সেদিনই আমরা ওঁদের একটু অস্ট্রেলিয় পার্লামেন্ট হাউসটা ঘুরিয়ে দিয়েছিলাম। বিশেষ উৎসাহ দেখিয়েছিলেন বলে মনে পড়েনা। তবে পার্লামেন্ট হাউসের কফি শপে তোলা ছবিটা দেখলে আন্দাজ পাওয়া যাবে হয়ত যে উনি সেদিন বেশ খোশ মেজাজে ছিলেন।

(১৫)

উত্তর কলকাতায় যে বাড়িতে বড় হয়েছিলাম একতলার বেশ বড় ঘরটিকে বলতাম "বৈঠকখানা"। আজকের ফ্ল্যাটবাড়ির "ড্রয়িং রুম" বা "হল" বোধহয় ঠিক এক নয়। অস্ট্রেলিয়ার "লাউঞ্জ রুম" এরও ঠিক সেই মেজাজটা নেই।

আমাদের বাড়ির "লাউঞ্জ রুম"টা কিন্তু সেই শুক্রবারটিতে এক বিশিষ্ট অতিথির মশলিশি ব্যক্তিত্বে সাবেকী বৈঠকখানার রূপ নিয়েছিল। চল্লিশ জনেরও বেশী অতিথি সমাগমের বর্ণনা দিতে সেই clichèd expression টাই ব্যবহার করতে হয় – তিল ধারণের জায়গা ছিল না। যে যেখানে পেরেছেন জায়গা করে নিয়েছেন সুনীলদার চারপাশে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ মাটিতে বসে। খাওয়া দাওয়াটা ছিল গৌণ – সুনীলদার কথা শোনা, নানা প্রশ্ন করাতেই সবার আগ্রহ। উনি নিরাশ করেন নি।

হাল্কা গল্প থেকে সাহিত্য, সমাজ, ভাষা, রাজনীতি – আড্ডার পরিধি ছিল বিস্তৃত। বেশ কয়েকটি কবিতাও পাঠ করেছিলেন সুনীলদা সে রাতে।

কয়েকটি ছবি তুলে দিলাম। উইস্কির বোতল সামনে রেখে সুনীলদা সেদিন সত্যিই আসর মাতিয়ে রেখেছিলেন।

Host হওয়ার দরুণ আমি পুরো সময়ে আসরে থাকতে পারিনি। তবে সে আক্ষেপ কিছুটা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন ক্যানবেরার এক বাসিন্দা দেবেশ হালদার এবং তাঁর ডাক্তার পত্নী নীপা – কথাবার্তার অনেকখানিই ভিডিও রেকর্ডিং করে। সেদিনের সান্ধ্য আসরের এক ঘন্টারও বেশী একটি ভিডিও হালদার দম্পতি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। ইউ টিউব বা অন্য কোন প্ল্যাটফর্মে এই অমূল্য মুহূর্তগুলি শেয়ার করার ইচ্ছে আছে – আপাতত অন্তরায় কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা।

মধ্যরাতের বেশ কিছুক্ষণ পরে আসর ভাঙার আগে ক্যানবেরার মানুষের তরফ থেকে কবিকে কয়েকটি স্মারক দেওয়া হয়েছিল। অনেকে ব্যক্তিগত ভাবে নানা উপহারও এনেছিলেন। জানিনা তিনটি শহরের মানুষের দেওয়া অসংখ্য উপহারের সঙ্গে সেগুলি ঠিকমত কলকাতা পৌঁছেছিল কিনা।

কথায় বলে, দুঃখ ভাগ করে নিলে কিছুটা হাল্কা লাগে। আনন্দ মিলেমিশে উপভোগ করলে মনটাআরও ফুরফুরে লাগে। হাসিমুখে অতিথিরা বিদায় নেবার পর সেদিন বড় খুশি, বড় পরিতৃপ্ত লাগছিল।

(১৬)

সুনীলদাকে ক্যানবেরায় আনার অন্যতম শর্ত ছিল একটি সর্বজনীন অনুষ্ঠান করার। আগেই জানিয়েছি, এই পরিকল্পিত সাহিত্য সন্ধ্যা পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন আবদুল চৌধুরী। শহরের কেন্দ্রে একটি হল ভাড়া করা হয়েছিল এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে।

দুই বাঙলার মিলিত এই জাতীয় সর্বজনীন অনুষ্ঠান ক্যানবেরাতে আগে কখনো হয়েছে বলে আমার জানা নেই। পাঁচ ডলার প্রবেশমূল্য ধার্য করা হয়েছিল। প্রায় বিনা প্রচারেই হল সম্পূর্ণ ভরে গিয়েছিল শতাধিক দর্শকে। স্হানীয় শিল্পীদের পরিবেশিত নাচ, গান, হাস্যকৌতুক, আবৃত্তি ছাড়াও সাহিত্য বিষয়ক নানা প্রশ্ন করা হয়েছিল সুনীলদাকে। তাছাড়া সুনীলদার গান এবং কবিতা পাঠও অনুষ্ঠানের অন্তর্গত ছিল।

সেই সময়ে এত সেলফি তোলার হিড়িক ছিল না – তবে অনুষ্ঠানের আগে পরে সুনীলদার সঙ্গে ছবি তোলার, অটোগ্রাফ নেওয়ার প্রবল আগ্রহ ছিল উপস্থিত দর্শকদের।

আমার সংগ্রহের সেদিনের কিছু ছবি :

গোবিন্দ বল্লভ নাথ নামে ক্যানবেরার এক বাসিন্দা আমাকে ধরেছিলেন উনি সুনীলদাকে অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবেন নিজের গাড়িতে। অনুরোধের বিশেষ মাথামুন্ডু বুঝিনি, কারণ অনুষ্ঠানের স্হান যদি চৌরঙ্গীতে হয় আমাদের বাড়ি টালায়, আর ভদ্রলোক থাকেন টালিগঞ্জে। যাইহোক, ভদ্রলোক একটা চমক দিয়েছিলেন বটে – হাজির হয়েছিলেন টুপি সমেত ড্রাইভারের বেশে ! গোবিন্দ বাবুর স্ত্রী আবার স্বামীর নাম করবেন না বলে ওঁকে ডাকেন "নাথ" বলে। সেই ডাক শুনে স্বাতীদি সরল ভাবে বললেন " বা বা, তুমি ওকে নাথ বলে ডাক ! খুব ভাল !"

অনুষ্ঠান শেষের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ভার ছিল আমার। গলা ভারি হয়ে আসছিল, কারণ এর পরেই কদিনের খেলা ভাঙার পালা।

(চলবে)

সিদ্ধার্থ দে – আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্নাতক। স্নাতোকত্তর পড়াশুনা আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ নিউ হ্যাম্পশায়ারে। ১৯৯০ সাল থেকে পাকাপাকি ভাবে অস্ট্রেলিয়াতে। দীর্ঘদিন ক্যানবেরা নিবাসী। ২০১৫-তে কর্মজীবন শেষ করে আপাতত সাহিত্য চর্চা, ভ্রমণ, টুকটাক লেখালেখি নিয়ে আছি। আর হ্যাঁ – ফেসবুকে, ওয়াটস্অ্যাপে ইত্যাদি সামাজিক মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাও জীবনের একটা বড় অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে হালে। আমার মূলত ব্লগধর্মী কিছু লেখা desidd.wordpress.com সাইটটিতে সংকলিত করেছি।

বড়গল্প

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য

অচেনা ঢেউয়ের শব্দ

পর্ব ৪

নিজের হারিয়ে ফেলা ভালবাসা ফেরত পেয়েছিল যশোধারা। সেইদিন বোধিসত্ত্বর হাত থেকে খাতাটা নিয়ে দৌড়ে বাড়ী ফিরেছিল ও। সেই পুরোনো ক্যাসেটগুলো বের করে একটা একটা করে সাজাচ্ছিল। খাটের এক কোণে পড়েছিল নীল মলাটের খাতাটা। মাকে কিছু বলতে হয়নি, সন্তানকে বুঝতে বেশী সময় লাগেনি লোপাদেবীর। যশোধারাও মশগুল নিজেকে নিয়ে। সেদিন বাড়ী ফেরার পথে অনেক অনেক কথা হলো সেই পুরোন বন্ধুর সঙ্গে। যশো কেন চলে এলে? জানো আর গান গাইনি। যশোধারা চুপ।

তুমি কি বোঝোনি কিছুই ?

এই প্রথম ওকে যশো বলে ডাকলো কেউ।

শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, ফিরে আসার দিন বুঝেছিলাম।

তাহলে ফিরে আসোনি কেন ?

উপায় ছিল না যে।

আর আজ ?

যশোধারা চঞ্চল হয়ে উঠলো। কি বলবে ও ?

বোধিসত্ত্বর কথা মনে আসছিল। বোধিসত্ত্বর বুকে মাথা রেখে ভালোবাসার গন্ধ নেওয়ার দিনটা ওকে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছিল।

চুপ কেন, আজ কি বলবে ?

– আজো তোমায় ভুলিনি। তোমার গান ভুলিনি।

– কিন্ত আমি গান ছেড়ে দিয়েছি। ডিপ্লোমা পড়ে এখন ডিগ্রী করছি।

অবাক হয়ে দেখছিল ওকে যশোধারা। কত সাবলীল, কত স্বচ্ছন্দ!

পায়ে পায়ে অনেকটা রাস্তা পেরিয়েছিলো ওরা। তারপর দুদিন কলেজে যায়নি ও। অফুরন্ত আড্ডা। ও এখানে কেন জিজ্ঞেস করায় বললো এটাই তো ভিত, বাবা মারা গেছেন, মা আর ও একা। এখন কলকাতায় থাকে। সিউড়ি থেকে ডিপ্লোমা করার পরই চাকরি পায়। এখন ডিসটেন্সে ডিগ্রী করে নিচ্ছে। কলকাতায় ভাড়া বাড়ী। এখানে কিছু জমি বিক্রি করে চলে যাবে। কিছুদিন আছে। এই কটা দিন যশোধারা যেন ভালোবাসার পাখনা মেলে উড়ে বেড়ালো।

রাস্তাটা ফুরোচ্ছে না। ওরা কেউ চায়ও না যে রাস্তাটা ফুরিয়ে যাক। পাশাপাশি হেঁটে চলেছে দুজন। কখনো গুনগুন গানের কলি কখনো বা আবার অকারণ হাসিতে চুঁইয়ে পরা খুশীর অনন্ত ভান্ডার। বিকেলটা একটু তাড়াতাড়ি অন্ধকার নামিয়ে আনছে। একটু আগেও একটা নিবু নিবু আলোয় মাখা ছিল চারিদিকটা। অন্ধকারটা ঝুপ করে নেমে এলো। রাস্তার আলোগুলো এখন আর একটা দুটো করে জ্বলে ওঠে না। ঘড়ির কাঁটার সাথে মিলিয়ে ওদের জেগে ওঠার সময় স্থির। ওরা

গল্পে মগ্ন। চারিপাশে কি হচ্ছে তাতে ওদের ভারী বয়েই গেলো। সেই দিনটার কথা ভাবলেও কেমন লাগে না। একসাথে হেসে উঠলো ওরা। আঙুলের ডগা ছুঁয়ে ঘাড় বেয়ে কানের লতি ছুঁতে চাওয়া সময়টাকে প্রাণপণ ধরে রাখতে চাইছে ওরা। সামনেটা অনেকটা ফাঁকা। লোক চলাচলও কিঞ্চিৎ কম। দোকান গুলোও নিজেদের মধ্যে দুরত্ব বাড়িয়েছে। নিজেদের পায়ের শব্দটা শোনা যাচ্ছে। জনবহুল এলাকা থেকে বেশ খানিকটা দূরের পথ। আকাশের আধখাওয়া চাঁদটাও বেশ আলো দিচ্ছে। ওদের গল্পগুলোও যেন একটু খেই হারিয়েছে। আলো আঁধারির পথটায় দুজনেই একটু চুপ। ঘড়ির কাঁটা জানান দিচ্ছে চাঁদ আর আলো দেবে না। দূরে কোথাও ট্রেনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। রেডিওতে গানটা বাজছে, "লাগ যা গলে . . . সায়দ ইস জনম মে মুলাকাত হো না হো. . . ", হালকা অন্ধকার কাটাতে ওদের শরীরে নামলো লক্ষ ওয়াটের আলো।

আমি আজ বাড়িতে সব জানিয়েছি। ধীর কণ্ঠে বলে উঠলো যশোধারা। অন্য পক্ষ চুপ।

আস্তে আস্তে কলকাতা যাবার সময় এগিয়ে এলো হারিয়ে পাওয়া বন্ধুর। যশোধারা বাড়িতে জানালো ওর মনের কথা। এদিকে সত্যপ্রিয় বাবুও কলকাতায় যাবার সব ঠিক করেই ফেলেছিলেন। স্ত্রীর মুখে সব কথা শুনে মেয়ে অন্ত প্রাণ বাবা বিশেষ কিছু বলেননি। শুধু জানতে চাইলেন কলকাতার কোথায় বাড়ী? যশোধরা চুপ, জিজ্ঞেস করা হয় নি তো। আজকে যাবার আগে দেখা হবার কথা। গাড়ী ছাড়াই বেরিয়ে পড়ল যশোধারা। বাসস্টপ থেকে দূরে একটা গুমটি, ঐখানে দাঁড়িয়ে ও। যশোধারা কাছে আসতেই একটা চিঠি ধরিয়ে বাস ছেড়ে দেবার আগে দৌড়োলো। অবাক যশোধারা জিজ্ঞেস করেই উঠতে পারলো না কোনোকথা ।

ওখানে দাঁড়িয়েই চিঠিটা খুললো। সংক্ষিপ্ত একটা লেখা।

যশো, অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে মাঝখানে, আমিও ভুলিনি তোমায়। আজও প্রতিটা কোষে তোমার নাম লেখা। কিন্ত কালের নিয়মে আমি বাঁধা পরে গেছি। মাকে নিয়ে আমি কলকাতায় আছি, ঠিকানা জানতে চেও না। তোমার সাথে ঘর বাঁধা আমার সম্ভব নয়। কারণটা না হয় উহ্য থাক। হয়তো আবার দেখা হবে। ভালোবাসার পরিণতি বিবাহ না হওয়াই ভালো। চিঠিতে আরো কিছু লেখা ছিল। তীব্র অভিমান আর আত্মসম্মান বোধে যশোধারা চিঠিটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেললো। বাড়ী ফিরে কোনো কথা না বলে নিজের ঘরে ঢুকলো ও। খানিক বাদে বেরিয়ে এসে বললো, বাবা কলকাতা যাওয়াটা কি খুব দরকার ? এক রাশ জিজ্ঞাসা নিয়ে তাকিয়ে রইলেন সত্যপ্রিয়বাবু। কিছু না বলে কাকে যেন ফোনে কিসব কথা বলতে লাগলেন।

পরীক্ষা শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাবার ইচ্ছে ছিল কলকাতায় থেকে বাকি পথটা, কিন্তু যশোধারা কলকাতা যেতে চায় না। কোনোভাবে জানতে পেরেছে বোধিসত্ত্বও চাকরী নিয়ে ওখানেই। সেইদিনের পর থেকে একবারও যোগাযোগ করেনি ছেলেটা। বুকটা মুচড়ে ওঠে ওর। কি করে এই কাজ করলো। ভিতরে ভিতরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে থাকে রোজ। শহরে শীত আসছে। বাবা একটু অসুস্থ, পিসি এসেছে দুদিন হলো। একলা যশধারা চুপ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

* * * *

কলকাতায় চাকরি নেবার পর থেকে কাজই ধ্যানজ্ঞান বোধিসত্ত্বর। অফিসের কাজেই শিলিগুড়ি এসেছে। এই প্রথম বাইরে আসা। ঠান্ডাটা বেশ ভালোই। হোটেলের ঘর থেকে আলো জ্বলা শহরটাকে মায়াবী লাগছে। সেই একইসময় দূরে কোথাও যশোধরা একলা দাঁড়িয়ে বারান্দায়, গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে পাতলা চাদরটা।

সন্ধ্যা এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। আলগা করে জড়িয়ে নিলো শীতের চাদরটা। কাস্তের মতো চাঁদটা নরম আলো ছড়িয়ে দিতে চাইছে। সন্ধ্যা যেন শহরটাকে নিয়নের আলোয় ধুইয়ে দিতে চাইছে। আর অনেক দূরের ওই একফালি চাঁদ চুপ করে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে সন্ধ্যার দিকে। শীতের পসরা সাজিয়ে নিয়ে একঢাল ভালোবাসা তার উষ্ণতার স্পর্শ বিলোচ্ছে।

দূরে অনেক দূরে একটা ছোট্ট পাহাড়ী শহরে ম্রিয়মান নিয়নের আলোগুলোর ব্যর্থ প্রচেষ্টা জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত শহরটার বুকে আঘাত হানার। দীর্ঘদেহী গাছগুলো হাত বাড়িয়ে ছুঁতে চাইছে জ্যোৎস্নাঘেরা পশমে মোড়া আকাশটাকে। অজস্র তারারা তাদের চিকমিকে চিহ্ন ছেড়ে রেখে রেখে পাড়ি দিয়েছে ছায়াপথ।

এই শহরে সন্ধ্যার তারারা আজ ভিনদেশী। তার খুব একলা লাগে, সে যে ছুঁতে পারে না তাদের। সে হাঁটতেই থাকে হাঁটতেই থাকে। শীতের ঝলমলে শহরটায় জবুথবু একলা সন্ধ্যার পদচারণায় সদা সঙ্গী শুধু একফালি চাঁদ। পাহাড়ী শহরটায় রাত নামছে। নিঝুম রাতে শীতের ওমে চাঁদ, তারা, কিছু রাত জাগা পাখী, পথভোলা পথিক আর নির্ঘুম চোখ। চাঁদের আলোর তীব্রতায় চোখ বুজে আসে পাহাড়ী শহরের।

এই শহরের সন্ধ্যা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে রাতের মোহানায় মিশে যাবে বলে। ভালোবাসা সব বিলিয়ে দিয়ে এখন একরাশ না বলা কথা বুকের খাঁজে লুকিয়ে রেখে রং মেখে রাস্তায়। কপাল চোখ গাল ঠোঁট স্তনসন্ধি হয়ে নাভিমূল ছুঁয়ে রাত নামছে গভীরে আরো গভীরে, বৃষ্টির লেখাগুলো নিয়ে ঝরে পড়ছে । রাত মোহানায় চন্দ্রাতপ। বৃষ্টির খোঁজে পাহাড়ী নির্ঘুম চোখ। এই শহরের সন্ধ্যতারা দূরের শহরের ছায়াপথে।

* * * *

ঘর ভর্তি লোক অবাক দৃষ্টিতে ওকে দেখছে। শুধু সুজাতা মাসিমা বলে উঠলেন হ্যাঁ, বোধিসত্ত্ব ঠিকই বলেছে। নাম দুটো পরপর শুনে যে ভদ্রলোক এতোক্ষণ মন দিয়ে জরিপ করছিলো মৃতদেহ, তিনি এগিয়ে এলেন। বোধিসত্ত্ব চ্যাটার্জী? মুর্শিদাবাদের ? একটু অবাক হয়েই তাকিয়ে রইলো বোধিসত্ত্ব। আমি সঞ্জয়, সঞ্জয় মিত্র। চেনা গেছে তো?

যশোধারাকে নিয়ে যাওয়া হবে পোস্টমর্টেম করার জন্য। পুলিস তার কাজ শুরু করে দিলো। সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ। সুজাতা মাসিমা বলতে লাগলেন, বড়ো চাপা মেয়ে ছিল। জীবনটা শুরু হবার সময়ই কিরকম গন্ডগোল হয়ে যায়। কোনো একজনকে ভালোবাসতো, কিন্ত চরম অবহেলার স্বীকার হয় । বাবা মায়ের সব বারণ অস্বীকার করে দেরাদুনের এক 'এনজিও'র সাথে যোগাযোগ করে বাকি জীবনটা অনাথ শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে মেয়েটা। শোক সহ্য করতে না পেরে বৌদি অকালে চলে যায়। অসুস্থ দাদা শেষ জীবনটা আমার কাছেই ছিল। বাবার মৃত্যুর পরে এসেছিলো। তারপর বহু সময় পর কিসব কাজ নিয়ে কলকাতায় এসেছিলো, আমার কাছেই এসেছিল, তারপর জানি না কি হলো, কেন হলো। ঘরের সবাই চুপ। বোধিসত্ত্ব অপার বিস্ময়ে শুনে যাচ্ছিল। বাকিরাও চুপ। মাধব বাবু খাটেই বসে তখনো। একটু অস্থির হয়ে উঠলেন। – অফিসার, আমাদেরও কি . . .

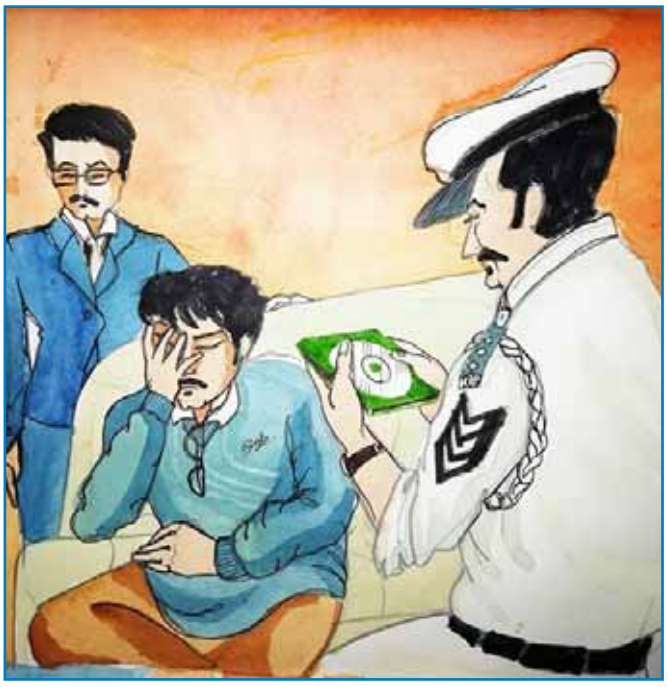

– হ্যাঁ আপনাদের সকলকেই দরকার।

সঞ্জয়, বোধিসত্ত্বর পুরোন বন্ধু, ল্যাব-এসিস্ট্যান্ট, এখন ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টে । বোধিসত্ত্বকে নিয়ে বাইরে গেলো। দামিনীর এ কি পরিণতি! বোধিসত্ত্ব তখনো হতবাক। চুপ করে ভাবার চেষ্টা করে চলেছে। টেপ রেকর্ডারটা আওয়াজ করে উঠলো . . .

চিটঠি না কোই সন্দেশ, না জানে কৌন সা দেশ যাঁহা তুম চলে গ্যায়ে . . .

যশোধারাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একে একে সবাই বাইরে এসে দাঁড়ালো।

– আপনিই প্রথম দেখেন এই অবস্থায়?

সুজাতা মাসিমা ঘাড় নাড়লেন সম্মতিসূচক।

– আপনারা কি সবাই বাড়িতেই ছিলেন যে যার? সবাই হ্যাঁ বলার পর রণজয়বাবু সোজা বোধিসত্ত্বর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,

– পূর্ব পরিচয় ছিল বলেই তো মনে হচ্ছে।

স্নেহাশিস ভট্টাচার্য – কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য সম্প্রচার দপ্তরের কর্মী। বর্তমানে কলকাতা দূরদর্শন ভবনে কর্মরত। বহুদিন থেকেই চলে আসছে সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠ এবং নিভৃত চর্চা। পেশাগত ও পারিবারিক ব্যস্ততায় যখন হারিয়ে যেতে বসেছিল তাঁর এই সৃষ্টিশীলতার ধারা, সে সময় এক বুধ সকালে আকাশবাণী মৈত্রীতে তাঁর নিজের লেখা পড়তে শোনা (এবং তারপর থেকে প্রায় নিয়মিত সেরার বাছাই এর তালিকায়), তাঁর সাহিত্যচর্চায় নতুন উৎসাহের সঞ্চার করে। সেই থেকেই চলে আসছে জীবনের জলরঙে স্বপ্ন বোনার কাজ, কখনো ছন্দে, কখনো বা গদ্যে . . .

রম্যরচনা

স্বর্ভানু সান্যাল

সেল্ফি স্বরূপ

পর্ব ৪

স্ব-বাবু মহারাজ যযাতিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ এই যে দিন-রাত অনবরত সকলের মুখে একটাই শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সেল্ফি। এটি কি রূপ? এটির খায় না অঙ্গে মর্দন করে? মহারাজ যযাতি বললেন উত্তম প্রশ্ন বৎস। খুবই রুচিকর আর আকর্ষণীয় এই বস্তু। ইহার পেছনে ইতিহাসও অতি মনোরঞ্জক। ধরাধামে কলিকালে এক ধরনের প্রাণির উদ্ভব হয়েছে যারা নিজেদের মানুষ বলে দাবি করে। আকৃতিগত ভাবে মানুষদের সাথে সাদৃশ্য থাকলেও বাকি সকলই ভীষণরকম বিসদৃশ। আসল মানুষ যেখানে ফুল, পাখি, গাছ, পাহাড়, নদী দেখতে ভালবাসত এই মনুষ্য-সদৃশ জীব শুধু নিজেদেরই দেখতে ভালোবাসে। আমার অনুমান এরা বেদান্তের "আত্মানং বিদ্ধি" অর্থাৎ "নিজেকে জানো" এই মহান শ্লোকটির অনুসারি। তাই এরা নিজেকে জানার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন ভাবে, বিভিন্ন কোণ থেকে, বিভিন্ন আঙ্গিকে নিজেকে দেখতে উৎসাহী। এই নতুন প্রজাতির মানুষকে উত্তরমানব বা প্রায়-মানব বলা হয়। নিজেকে জানার এই ইচ্ছা এদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে প্রবল থেকে প্রবলতর এবং অনধিক্রম্য হয়। প্রথম প্রথম এরা নিজেকে দেখার সাধ পুর্ণ করতে চিত্রকরকে দিয়ে নিজেদের চিত্রিত করাতো। অর্থাৎ নিজের ছবি আঁকাত। কিন্তু সে অতি সময় সাপেক্ষ ও ব্যায়-বহুল বলে বেশিরভাগ প্রায়-মানবকেই আয়ানায় নিজের মুখ দেখেই সন্তুষ্ট থাকতে হত। পরে এরা এক ধরনের যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলে যার নাম "চিত্র বন্দি যন্ত্র"। অর্থাৎ এটা এক ধরণের ছবি ধরার ফাঁদ। এই অত্যাশ্চর্য যন্ত্রের সাহায্যে যে কোন দৃশ্যকে ফাঁদে ফেলে বাক্স-বন্দি করা যায়। কোন কিছুর দিকে এই যন্ত্র তাক করে একটি বোতাম টিপলেই ব্যাস। সুড় সুড় করে সে দৃশ্য এসে বাক্সের মধ্যে ঢুকে যাবে, সাথে সাথে বাক্সের দরজা বন্ধ আর ছবি বাক্স-বন্দি। সে ছবি তখন বাক্সের মধ্যে যতই ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করুক না কেন, বাক্স থেকে বেরোনর কোন পথ নেই। কিন্তু প্রথম প্রথম সে যন্ত্র আয়তনে বৃহৎ হওয়ায় নিজের দিকে তাক করে বোতাম টেপার সুবিধে হত না। তখন সাগরে, পাহাড়ে জাদুঘরে, বাজারে সর্বত্র যেকোন চেনা-অচেনা-অর্ধচেনা লোক দেখলেই এই প্রায়-মানবদের বলতে শোনা যেত "দাদা, আমার একটা ছবি তুলে দিন না" বলে তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই সেই ছবি বন্দি করার কলটা তার হাতে তুলে দিয়ে হাসিমুখে, ঘাড় বেঁকিয়ে বিভিন্ন নৃত্য বিভঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ত। এই ভাবেই কিছুকাল ধরে এরা নিজেকে দেখার এবং জানার তৃষ্ণা মেটাচ্ছিল। কিন্তু অপরের সাহায্যের প্রয়োজন থাকায় সর্বতোভাবে নিজেকে জানতে পারছিল না অর্থাৎ যথেস্ট পরিমাণে নিজের ছবি তুলতে পারছিল না এবং তদহেতু অবসাদে ভুগছিল। ক্রমে ক্রমে এই যন্ত্র ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে একটি আঙ্গুর ফলের মত ছোট হল। এবং প্রায়-মানবদের আর এক আবিষ্কার দুরভাস যন্ত্রের মধ্যে স্থান পেল। তখন ঐ যন্ত্র নিজের দিকে তাক করেও নিজের চিত্র বাক্স-বন্দি করা সম্ভব হল। তখন প্রায়-মানবেরা সর্বপ্রকারে নিজেকে জানতে প্রয়াসী হল। সময়-অসময়, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নায় এরা নিজেদের পানে ঐ যন্ত্র তাক করে নিজেদের ছবি তুলতে লাগল। ইহাই সেল্ফি। অন্যের সাহায্য ব্যাতিরেকে নিজের স্বরুপ উদঘাটন করতে পেরে ইহাদের আনন্দের অবধি থাকল না। তখন মন্ত্রিমশাই থেকে মুচি-কসাই, টাটা-বিড়লা থেকে গরিব চা-ওয়ালা, রাজনীতিকার থেকে চোর পকেটমার, রাজা-গজা থেকে ভুমিহার প্রজা, কেস্ট-বিস্টু থেকে পটল, কেয়া, মিস্টু সকলেই ঘুমনোর সময়টুকু ছাড়া সর্বক্ষন সেল্ফি তুলতে থাকল। এমনকি কিছু কিছু প্রায়-অতিমানব গতিমান ট্রেন-এর সামনে বা উঁচু ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে সেল্ফি দ্বারা নিজেকে জানার প্রয়াস করে হাসি মুখে প্রাণ বিসর্জন দিতেও পিছপা হল না। শুধু তাই নয়, ইহারা এই পর্বত প্রমাণ সেল্ফি বা নিজস্বি সকলকে ইহাদের আর একটি আবিষ্কার আন্তর্জালের মাধ্যমে মুহুর্তের মধ্যে মর্তলোকের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে একই সাথে এরা সকল ভুভাগে দৃশ্যমান হল। এবং এক ধরনের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় সবাই একে অপরকে অপূর্ব

সুন্দর কিম্বা সুন্দরী বলে বাহবা দিয়ে নিজেদের আত্মগরিমা পুনঃ পুনঃ উজ্জীবিত করতে থাকল। তখন প্রায়-মানবেরা স্বোহম অর্থাৎ "আমিই সেই ব্রহ্ম" সেই পরম বোধে উত্তীর্ণ হয়ে আত্মজ্ঞানী হল। সচ্চিদানন্দের কৃপায় সৎ অর্থাৎ নিজের অস্তিত্বকে জানান দিতে নিজের চিৎশক্তি অর্থাৎ ইচ্ছাশক্তির সহায়তায় সেক্ষি আবিষ্কার করে এই প্রায়-মানবেরা আনন্দ লাভ করল এবং অনন্ত-আনন্দ-কারণ-সাগরে নিমজ্জিত হল।

(চলবে)

স্বর্ভানু সান্যাল – জন্ম হাওড়ার রামরাজাতলায়। ছাত্রজীবন কেটেছে পুরুলিয়া, হাওড়া ও দুর্গাপুরে। কর্মজীবনে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। চাকরিসূত্রে বিভিন্ন দেশ ঘুরে শেষ নয় বছর আমেরিকার শিকাগোয় কর্মরত। পেশাদারি এবং পারিবারিক জীবন বাদ দিলে, তার অনেকটা সময় কাটে সাহিত্যচর্চা করে। অনুগল্প, রম্যরচনা, কবিতা, স্মৃতিকথা নিয়মিত লিখে থাকেন। ''যযাতির ঝুলি'' (https://jojatirjhuli.net) নামে তার ব্যক্তিগত ব্লগ আছে এবং সেই ব্লগ এর মাধ্যমে তার লেখা নিয়মিত পাঠকদের সাথে ভাগ করে নেন। ব্লগটি বেশ জনপ্রিয় এবং সেটির সাথে লিঙ্কড একটি ফেসবুক পেজও আছে (https://www.facebook.com/jojatirjhuli)। প্রতিটা লেখকের মধ্যেই বাস করে তার লেখার এক চরম ও নির্দয় বিচারক। স্বর্ভানুর বিচারে সে সাহিত্য সাগরের ধারে বসে শুধুমাত্র নুড়িই কুড়িয়েছে। অন্য শখের মধ্যে আছে বেড়ানো, ফটোগ্রাফি, গান শোনা। আর অবশ্যই কারণে অকারণে একটু গড়িয়ে নেওয়া।

পল্লববরন পাল

সনেটগুচ্ছ

সনেট ৭

তারপর রাক্ষুসি আমাকেও খেলো
হৃদয়ভাজার সাথে বোন্‌ম্যারো সস্‌
ব্রেনের স্যালাড্‌ সহ — আমার অলস
চব্বিশ গুন সাত হলো এলোমেলো ।
কাজ-টাজ ডকে ওঠে, কবিতায় শুধু
অধর-অমৃত দেন, উরুসন্ধির
নর্দমা উপচায় দুগ্ধাভ নীর ।
অক্ষর-মাত্রায় ছন্দের ধু ধু
পদাবলী প্রান্তরে যখন এলেম,
ভেসে গেলো পাললিক রাইশ্যামগীতে
পালি বলে — এরই নাম নিকষিত প্রেম
উজান-শরীর ঢালে বিষ বিপরীতে ।

ডিনার মেনুতে আজ উৎসব-ছবি
পালির সামনে প্লেটে রোস্টেড্‌ কবি ।

সনেট ৮

রৌদ্রকে খুঁজছিলো এক প্রান্তর
যেখানে বিছিয়ে শুয়ে থাকবে দুপুরে
রিনরিন হাওয়া এসে বাজবে নূপুরে
খুঁজতে খুঁজতে দেখে — এক গানঘর
কাঁচের দেয়াল ঘেরা, অন্দর খালি
মার্বেলমেঝে — ঠিক মাঝখানটায়
পিতল প্রদীপ হাতে এবং দু'পায়ে
ত্রিভূজ মুদ্রা এঁকে ধ্যানস্থা পালি
প্রদীপের শিখা হয়ে জ্বলে ওঠে রোদ
পালির শ্রীমুখময় ফোটাচ্ছে ফুল
সুসময় বিস্তৃত সবুজ সরোদ —
প্রান্তর পিছটান দিলো বিলকুল

সেই রোদ্দুর-মুখ নিয়ে আজ পালি
প্রান্তরে শান দেয় ধারালো ভোজালি

কর্মসূত্রে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের মাস্কাট শহরে একটি নামী বহুজাতিক কন্‌সাল্‌টেন্সি কোম্পানির চিফ্‌ আর্কিটেক্ট, আর মর্মসূত্রে আগাপাশতলা এক বামপন্থী বিষণ্ন কবি — প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৫ — যার মধ্যে আছে দুটি উপন্যাস — একটি গদ্য, একটি পদ্যে লেখা । গান, ছবি আঁকা, আর পড়াশোনা — খুব কাছের বন্ধু এই তিনজন ।

মৌসুমী রায়

লাদাখ ভ্রমণ

পর্ব ৪

উত্তর লাদাখে প্রায় চোদ্দ হাজার ফুট উচ্চতায় গাঢ় বাদামি আর খয়েরি রঙের পাহাড়ের কোল ঘেঁষা এই প্যাঙ্গঙ লেক। লেকের বিশালতা অবাক করার মতো। লেক বলতে আমরা যা বুঝি তা একেবারেই না। নদীর মতো মাইলের পর মাইল টানা জলরাশি হলেও তা প্রবহমান নয়। ১৩৪ কিমি দীর্ঘ এই লেকের প্রায় চল্লিশ শতাংশ এদেশে। বাকী ষাট শতাংশ চীনের অধীন। মাঝে সিয়াচেনের কাছে কিছুটা অংশ নিয়ে দুই দেশের মধ্যে দড়ি টানাটানি। লেকটির বিশেষত্ব হলো কোনো নদী বা হিমবাহ, এর উৎস নয়। এটির সৃষ্টি নিজে থেকেই।

গাড়ি থেকে নেমে লেকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। যতদূর চোখ যায় শান্ত স্থির স্ফটিক স্বচ্ছ নীল জল। দেখে মনে হয় স্বর্গ যেন এখানেই মর্ত ছুঁয়েছে। সে সৌন্দর্য শুধুই অনুভবের, বর্ণনার নয়। খুব ইচ্ছে হলো এই বিশালতার একটু স্পর্শ পেতে। জুতো খুলে জলে পা ছোঁয়ালাম। গায়ে কাঁটা দেওয়া বরফশীতল স্পর্শ। হঠাৎই এক জোড়া সি গাল কিছু দূরের জলে এসে একটু বসতে না বসতেই পাখা মেলে উড়ে গেলো। যেন ঘন নীল-জলের কার্পেটের ওপর দুধ সাদা বরফের টুকরো। কি অপূর্ব রঙের বাহার! কোন সমুদ্রতট থেকে এতো উঁচুতে এমন দুর্গম জায়গায় ওই সি গাল দম্পতি উড়ে এসেছে তার ঠিকানা অজানাই রয়ে গেলো।

আরো কিছুটা এগিয়ে ভিউ পয়েন্টে পৌঁছলাম। এই অংশটিকে গাইডরা করিনা আমিরের (থ্রি ইডিয়টস) স্যুটিং স্পট বলে চেনাতে ভালোবাসে। নানা ভাষাভাষী মানুষের ভিড়ে জমজমাট। থ্রি ইডিয়টস সুপারহিট হওয়ার পর জায়গাটার ব্যবসায়িক গুরুত্ব বেশ বেড়েছে বোঝা যাচ্ছে। ফিল্মে ব্যবহৃত নানা জিনিসের মাধ্যমেও চলছে অর্থ উপার্জন। পর্যটক নির্ভর এই সব প্রান্তিক মানুষের আর্থিক পরিকাঠামো উন্নত হোক ক্ষতি নেই কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ইট কাঠ কংক্রিটের ভিড়ে এই অপরূপ প্রকৃতির শুদ্ধতা যেন হারিয়ে না যায় এটাই চিন্তার।

বেশ অনেকক্ষণ লেকের ধারে কাটিয়ে প্রায় সন্ধ্যের মুখে আমরা টেন্টে এসে ঢুকলাম। কিছুদূরে ঠিক লেকের বিপরীতে আমাদের এই টেন্ট। নাম প্যাঙ্গঙ এস্কেপ। দূর থেকে তখন জলের নীল রঙ কালচে দেখাচ্ছে। আকাশের রঙের প্রতিফলনই এই লেকের রঙ নির্ধারক। কর্মার কথা অনুযায়ী দুদিন আগেও এই রঙ দেখা যায়নি মেঘলা আকাশের কারণে। এ অঞ্চলের রূপ প্রকৃতির মর্জিমাফিক পাল্টে যায়।ভাগ্যে থাকলে তবেই তার দর্শন মেলে।

প্যংগঙ লেক

সকালে ঘুম ভেঙ্গে বাইরে আসতেই সেই স্বর্গীয় নীলের প্রশস্ত লেক চোখের সামনে। ভোরের আলোতে তার কি স্নিগ্ধ রূপ। বেরোতে হবে, তাই বেশিক্ষণ আর বসা গেলো না। লাগেজ প্যাক করে তৈরি হয়ে নিলাম। আমাদের আজকের গন্তব্য সোমোরিরি লেক।

ব্রেকফাস্ট সারতে রেষ্টুরেন্টে গিয়ে দেখি নুব্রার ওই মেয়েদের দলটি নিজেদের মধ্যে গল্প আর হাসি ঠাট্টায় মশগুল। চোখাচোখি হতে দু এক জন আমাদের সাথেও গল্প জুড়ে দিল। আলাপ হতে জানা গেল ওরা মুম্বই থেকে এসেছে। পেশায় ডাক্তার। একই হাসপাতালের তবে আলাদা আলাদা বিভাগে কর্মরতা। আজ ওরা এখান থেকেই লেহ ফিরে যাচ্ছে। অতি কষ্টে কদিনের ছুটি নিয়ে এই আউটিং। খেয়ে বেরোতে যাবার মুখেই আবার দেখা ওই মুসলিম মেয়েটির সাথে। নাম ডেইজি। ওরাও আজ লেহ ফিরে যাচ্ছে। ভাড়া করা বাইক ওখানে ফেরত দিয়ে ফ্লাইটে দিল্লি হয়ে কলকাতা। ডেইজি IT sector এ কাজ করে। চারদিনের ছুটিতে লাদাখ এসেছে বাইক এডভেঞ্চারে।

একে একে সবাইকে বিদায় জানিয়ে এবার আমাদের যাবার পালা। কর্মা গাড়িতে লাগেজ প্যাক করে রেডি। আমরাও তৈরি। এমন জায়গা ছেড়ে যেতে যেন মন চায় না। আজ এখান থেকে আমরাই শুধু সোমোরিরির যাত্রী। আরও এক অজানা পথে আরও এক নতুনের খোঁজে, কিছু নতুন অভিজ্ঞতায় ঝুলি ভরাতে . . . .

প্যাঙ্গঙ থেকে সোমোরিরি যাত্রাপথ এক স্বর্গীয় অনুভূতি। প্যাঙ্গঙের গা ঘেঁষা পথ। প্রায় তিরিশ কিমি একটানা চলেছি তার পাশে পাশে। ভোরের সূর্যের কিরণ স্বচ্ছ নীল জলে পড়ে মুক্তোর মতো চকচক করছে। ঠিকরে পড়ছে তার দ্যুতি। হঠাৎ দেখি নির্জন হ্রদের পাশে দুটো সোনালি ব্রাহ্মণী হাঁস মিঠে রোদে পিঠ পেতে রোদ পোয়াচ্ছে। দেখার সৌভাগ্য হলেও চলতি গাড়িতে ছবি তোলার কোনো সুযোগ পেলাম না। শুধু মন ক্যামেরায় ধরা রইলো আজীবন।

এ পথে রাস্তা বলতে তেমন কিছু নেই। গাড়ির চাকার দাগ ধরেই পথ চলা। সামনে পেছনে কোনো গাড়িরও দেখা নেই। মাঝে মাঝে দু একজন বাইকারোহী হাত নাড়িয়ে চলে যাচ্ছে। চকচকে নীল আকাশে সাদা মেঘের টুকরোগুলো স্থির আটকে আছে। আমাদের মতো তারাও যেন ধুসর পাহাড় ঘেরা ওই নীল জলের প্রেমে পড়ে গেছে।

কর্মা জানালো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্যাঙ্গঙ ভারতের সীমা পার করে চীনের দিকে ঘুরে যাবে।

সিয়াচেনের কাছে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে লেকের জল বাঁ দিকে ঘুরে ক্রমশ নজরের বাইরে চলে যাচ্ছে। চোখের পলক পড়ছে না। বুকের ভেতরে কেমন যেন একটা চাপা কষ্ট। দূরে পাহাড়ের ওপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর বাঙ্কার। ওই ধূ ধূ প্রান্তরে তারা অতন্দ্র প্রহরীর মতো পাহারায় আছে। কর্মার থেকে জানলাম পেছনের পাহাড়ে চীন সেনার বাঙ্কার। ওরাও এ অঞ্চল দিয়ে যাওয়া প্রতিটা গাড়ির ওপর নজর রাখছে। অমন অপরূপ প্রকৃতির মাঝে যুযুধান দুই দেশের সেনাবাহিনীর চাপা উত্তেজনা যেন আমাদের মধ্যে ও সঞ্চারিত হলো।

সোমোরিরি লেক

জুলাই এর শুরুতে দিনের বেলা ঠান্ডা তেমন খুব কিছু না। এ অঞ্চলে এই সময়েই পর্যটকের আনাগোনা। এই ক'মাস কর্মার গাড়ির ব্যবসা বেশ ভালোই চলে। অক্টোবরের পর থেকে প্রায় বন্ধ সব। চারিদিক বরফে ঢেকে গিয়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। সেসময়ে কর্মা কাজের জন্য সিয়াচেনে চলে আসে। শীতে সিয়াচেনের অকল্পনীয় ঠান্ডায় সেনাবাহিনীর হয়ে নানা কাজ করে দেয়, মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে। তিন মাসের চুক্তি ভিত্তিক কাজ। পরের তিন মাস পর্যায়ক্রমে আবার অন্যদের। হিমালয়ের কাঠিন্যের সাথে তাল মিলিয়ে কি অসম্ভব কঠিন এদের জীবন সংগ্রাম। আমাদের মতো শহুরে মানুষের কাছে যা কল্পনাতীত।

প্যাঙ্গঙ থেকে সোমোরিরির পর্যটক খুব কম। বিদেশী পর্যটকদের এ অংশে যাওয়ার ছাড়পত্র মেলেনা ভারত চীন সীমান্তের কারণে। যারা যান না বা যেতে পারেন না তারা এই ২৩৫ কিমি যাত্রা পথের অপরূপ নিসর্গ থেকে বঞ্চিত হন বলাই বাহুল্য। চকচকে নীল আকাশে নিশ্চল ভেসে থাকা সাদা মেঘের ঘন কালো ছায়া, সুন্দরী বাদামী পাহাড়ের গায়ে যেন কলঙ্ক এঁকে দিয়েছে। প্রথম চোটে বোঝার উপায় নেই এ রঙ কিসের, এমনই অবিচল।

গাড়ি চলেছে পাহাড়ে ঘেরা এক বিস্তীর্ণ উপত্যকার মাঝখান দিয়ে। নির্জন এই ভ্রমণে আমাদের আজকের সঙ্গী কিছু জংলী গাধা (এখানকার নাম কিলাং), ছানাপোনা সহ বন্য উড়িয়াল আর শিং কাটা পশমিনা ভেড়ার দল। এই উড়িয়াল গৃহপালিত ভেড়ার আদি রূপ। উপত্যকার নানা জায়গায় পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে বা হ্রদের পাশে এরা নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ইতিমধ্যে একটি গাড়ি আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গী হয়েছে। সত্তরোর্ধ এক ভদ্রলোক প্যাঙ্গঙ থেকে বেরিয়ে রাস্তা বুঝতে না পেরে সিগনাল দিচ্ছিলেন। দিল্লীর বাসিন্দা, সস্ত্রীক নিজের গাড়ি নিয়ে সমগ্র কাশ্মীর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কর্মা লুকিং গ্লাসে দেখত পেয়ে গাড়ি থামিয়ে তাঁর কাছে ছুটে যায় এবং সমস্ত রাস্তা নানা ভাবে তাঁকে সাহায্য করে। এই বয়সে এমন অজানা দুর্গম জায়গায় নিজে চালিয়ে ঘুরতে এসে এমন মানবিকতার স্পর্শ পাওয়া সত্যি ভাগ্যের। জানিনা বিষয়টি তাঁর কতোটা স্মরণে থাকবে কিন্তু এই স্বার্থ সর্বস্ব দুনিয়ায় কোনো পারিশ্রমিক ছাড়া এমন কর্তব্যনিষ্ঠার সাক্ষী হতে পেরে মানুষ হিসেবে সত্যি গর্ব অনুভব হচ্ছিল।

সোমোরিরি পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যে ছুঁই ছুঁই। পথে কয়েকটা ছোট ছোট নীল জলের হ্রদ পেরিয়ে এখন সোমোরিরির সামনে। প্যাঙ্গঙের মতো চাইলেই ছোঁয়া যায় না একে। ভিউ পয়েন্ট বেশ উঁচুতে। তীব্র হাড় কাঁপানো ঠান্ডা হাওয়া। আমাদের দু এক জনের অল্প বিস্তর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। পোর্টেবল অক্সিজেন সিলিন্ডারটা কাজে লেগে গেল। অসম্ভব ঠান্ডা হাওয়ায় বেশিক্ষণ আর দাঁড়ানো গেলো না। চললাম ক্যাম্পের দিকে। আমাদের "ইয়াক ক্যাম্পে"র ঘরে তখনো আলো জ্বলেনি। ঠিক সাড়ে সাতটায় আলো জ্বলতে ক্যান্টিনে গিয়ে চা পকোড়া সহযোগে একপ্রস্থ আড্ডা দিয়ে একেবারে ডিনার সেরে রুমে ফিরলাম। দিন ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। আর মাত্র দুটো দিন। তারপরই যে যার ঘরে ফেরার পালা . . . .

(চলবে)

মৌসুমী রায় – সেবায় ও পালনে, শুশ্রূষা ও পরিচর্যায় ব্যস্ত গৃহবধূ। যৎসামান্য অবকাশের আকাশে রামধনুর খোঁজ, কবিতা লেখায়, সাহিত্য পাঠে। পাঠকের সাথে ভাগ করে নিয়েছেন তাঁর লাদাখ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। উপরি পাওনা প্রাঞ্জল গদ্য আর কিছু নয়নাভিরাম ছবি।

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী

তিন শালিখ

দ্বিতীয় অঙ্ক

(কাজিও ইশিগুরোর গল্প অবলম্বনে)

(চঞ্চলদের বসার ঘর । সোফা, টি ভি, শো কেস এসব দিয়ে সাজানো। পাশেই রান্নাঘর, সামনে খাবার টেবল। পূর্ণ সোফায় বসে টিভি চালায়, প্রথমে বসে, তারপর শুয়ে দেখতে থাকে এবং ঘুমিয়ে পড়ে। আলো কমে এসে আবার জ্বলে। পূর্ণ ধীরে ধীরে উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙে। উঠে শোকেসে রাখা বইগুলো উল্টে পাল্টে দেখে, সি ডির কালেকশান দেখতে থাকে।)

পূর্ণ – নাহ, একটু চা খেলে ভাল লাগতো এবার (রান্নাঘরে গিয়ে চা বানানোর সরঞ্জাম খোঁজে। চা বসিয়ে খেয়াল হয় টেবিলের উপর একটা গোলাপি রঙা ডায়েরী, তোলার জন্য হাত বাড়িয়ে আবার সরিয়ে নেয়)

অমলার ডায়েরী হবে, ভুল করে ফেলে গেছে। (ডায়েরী হাতে তুলে নিয়ে বাইরে থেকে দেখতে থাকে) না, অফিসিয়াল কিছু তো নয় । মনে হচ্ছে পারসোনাল ডায়েরী। অমলা কি ডায়েরী লেখে? কিন্তু সেরকম কিছু হলে এরকম ভাবে ফেলে রেখে যাবে কেন? ও যেরকম গুছানো মেয়ে এরকম একটা পার্সোনাল জিনিশ কক্ষণো এভাবে ফেলে যেতে পারে না। নাকি ও চাইছে যে আমি দেখি ? হয়তো ওর আর চঞ্চলের মধ্যে যেসব চলছে সেটা ও এভাবে জানাতে চায়। মুখে বলতে লজ্জা পাচ্ছে?

(দূরে সরে যায়) কিন্তু যদি তা না হয়? তখন? অমলা ভুল করে ফেলে গিয়ে থাকলে ? যা ভীষণ রাগী হয়ে গেছে, জানতে পারলে ভীষণ চটে যাবে? তখন আবার মহা মুশকিল!

(আবার ডায়েরীর কাছে আসে) এক কাজ করা যাক, ডায়েরীরটা খুলবো, যদি সেরকম কিছু থাকে আবার বন্ধ করে দেবো যেরকম কে সেরকম । তাহলেই তো হয়ে গেল।

(ডায়েরীটা তোলে, হাতে নিয়ে প্রথম পাতা খোলে, আবার রেখে দেয়। ফিরে গিয়ে সোফায় বসে আর টিভি চালায়। রিমোটে চ্যানেল চেঞ্জ করতে থাকে । উঠে গিয়ে শো কেসে বই নিয়ে ঘাটাঘাটি করে, শেষ পর্যন্ত আবার ডায়েরীর কাছে ফিরে আসে। ডায়েরি নিয়ে সোফায় বসে।)

না এতো দেখছি কি কি কাজ আছে তার লিস্ট, টু ডু লিস্ট । ফোন সুদীপ্তা, ওরে বাবা – জাস্ট ডু ইট ! হোয়াই দ্য হেল নট ডান ইয়েট?

এ যে দেখি নিজেকেই নিজে গালাগালি দিচ্ছে!

৩০শে এপ্রিল – এখনও সুনীলের বইটা শেষ হয়নি কেন? সেই সময় শেষ করে মাধু কে ফেরত দিতে হবে। দু দিনের মধ্যে।

৪ঠা মে – পূর্ণ আসছে , ঘর সাজাতে হবে। উফ যত আপদ, কেন করব? হু কেয়ারস? কোথাকার লাট?

(রাগে পূর্ণ থমথম করে, তার হাত ডায়েরীর পাতা মচলাতে শুরু করে)

৭ই মে – আসবে মহারাজাধিরাজ আজকে, কাঁদুনি গাইবে, মুখ বুজে শুনতে হবে যত ধানাই পানাই! নিনকম্পুফ।

আমাকে বলেছে? আমাকে? নিশ্চয় আমাকে, আজকের তারিখ, আমি ছাড়া আর কে (রাগে ডায়েরীর পাতা হাতের মুঠোয়) (হঠাৎ ডায়েরীর পাতার দিকে চোখ যায়)

অরে বাবা, একি হল? পাতাটা তো পুরো দুমড়ে গেছে! (কোনমতে দুমড়ান পাতা সোজা করার চেষ্টা করে)

এতো হচ্ছে না কিছুতেই! এখন কি হবে ? যে কিনা ডায়েরীতেই এমন খান্ডারনি হয়ে লিখছে, এটা দেখলে তো আমাকে –

(ফোন বাজতে থাকে, পূর্ণ গিয়ে ওঠায়) কে চঞ্চল?

চঞ্চল – (ষ্টেজের এক কোনায় চঞ্চলকে দেখা যায়, কানে মোবাইল) কিরে, ফোন তুলিস নি কেন? আমি আগেও ফোন করেছিলাম।

পূর্ণ – তুই কোথায়? তোর না ফ্লাইট ক্যাচ করে বম্বে যাবার কথা ছিল ?

চঞ্চল – সেটাই তো বলছি, আমি এয়ারপোর্টে, কিন্তু ফ্লাইট ডিলে হচ্ছে।

পূর্ণ – চঞ্চল, শোন। একটা ভীষন প্রবলেম হয়েছে, কি করবো বুঝতে পারছি না।

চঞ্চল – সত্যি বলছি, আমার ফ্লাইট ডিলে হয়েছে -

পূর্ণ – হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে । তার আগে তুই আমার কথা শোন । আমি একটা বোকার মত কাজ করে ফেলেছি।

চঞ্চল – পূর্ণ, আমি বুঝতে পারছি। তুই ভাবছিস আমি অফিসের কাজে যাচ্ছি না, তাই না? তুই হয়তো ভাবছিস তোকে এখানে ভিড়িয়ে দিয়ে আমি অন্য কোন মেয়ের সঙ্গে ফুর্তি করতে যাচ্ছি। ঠিক, তাই ভেবেছিলি, আমি জানতাম। আমার হঠাৎ মনে হল যে তুই এরকম ভাবতে পারিস। আমাদের ব্যবহার যেরকম দেখলি, তুই এরকম ভাবলে অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু শুনে রাখ সেটা ডাহা ভুল। ইউ আর রং।

পূর্ণ – ঠিক আছে, আমি বুঝতে পারছি তোর কথা, কিন্তু একটা মুশকিল হয়েছে চঞ্চল।

চঞ্চল – না, তোকে এটা আগে মানতে হবে। আমি বম্বে যাচ্ছি, এয়ার পোর্টের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস তো পিছনে। আমার অফিসের কাজ আছে, এবং এর মধ্যে কোন লাভট্রায়াঙ্গেল নেই । কোন মেয়ের সঙ্গে আমি কিচ্ছু করছি না।

পূর্ণ – আমি কি একবারও সেটা বলেছি।

চঞ্চল – জানি কি ভাবছিস । আচ্ছা মেয়ে নেই কোন এইট্রায়াঙ্গেলে, কিন্তু ছেলে? বল, বল ভেবেছিলি কিনা ?

পূর্ণ – সত্যি বলতে কি, নেভার। আমার কখনোই তোকে গে বলে মনে হয় নি চঞ্চল।

চঞ্চল – শাট আপ । আমি বলছিলাম ছেলের কথা, মানে অমলার কোন বয়ফ্রেন্ড। তুই কি মনে করিস সেটা সম্ভব? অমলার জীবনে অন্য পুরুষ? না, না ,না সম্ভব নয় । আমি ওকে ভাল করে চিনি।

পূর্ণ – আরে বাবা, আমি তো সেটাও বলিনি।

চঞ্চল – আমাকে বলতে দে। ট্রাবলটা কি জানিস, ও এটা নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে। ও ভাবছে এরকম কিছু , সেটা আমি বুঝতে পারছি। যেমন সন্দীপ সান্যালকে নিয়ে।

পূর্ণ – সেটা কে?

চঞ্চল- হট শট ! নিউ এজ অ্যাডভারটাইজিং – এর মালিক। খুব নাম করছে, আমি জানি সেটা, অ্যাডভারটাইজিং-এর দুনিয়ায় রাইজিং স্টার – অমলার কাছেই শোনা, অল দ্য ডিটেলস অফ হিস সাক্সেস ইন লাইফ!

পূর্ণ – তোর কি মনে হয় ওরা মেলা মেশা করছে?

চঞ্চল – না, আমি তোকে বললাম না । সেরকম কিছু হয় নি । সম্ভবও নয় । সন্দীপ সান্যালের সঙ্গে থাকে মুনালিকা – ওয়ান অফ দ্য টপ মডেল । জাস্ট বিকজ হি ইজ ইন আওয়ার অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স, ও হঠাত অমলাকে তোল্লা দেবে এটা ভাবা বোকামি । আর ওদের প্রফেশনে অর্ধেক বয়েসের মেয়েদের সঙ্গে ঘোরার নিয়ম, অমলাকে কেন পাত্তা দেবে?

পূর্ণ – তাহলে আর চিন্তা করছিস কেন? সব ঠিকই আছে ।

চঞ্চল – না, নেই । আরও আছে- বিমল আহুজা, ইকনমিস্ট । টিভি তে মাঝে মাঝেই ওকে দেখা যায় । স্মার্ট অ্যাস কমেন্ট করে ইন্ডিয়ান ইকনমি নিয়ে । লোকে সেটা শোনেও । প্লে বয়ের মত চেহারা । আমার মনে হয়, মেয়েদের নিউজ আইটেমের দিকে অ্যাট্র্যাক্ট করার জন্যই চ্যানেল থেকে ওকে ডাকে । আর অমলার মত মেয়েরা গদগদ হয়ে যায় । কিন্তু অমলা যেটা বোঝে না, ওরা কেন ওকে পাত্তা দেবে? আমি সিওর অমলা ওদের কথা ভাবে, ওদের সঙ্গে আমার তুলনা করে করে আরও বেশি ডিপ্রেসড হয়ে যায় ।

পূর্ণ – চঞ্চল, এসব শুনবো পরে । কিন্তু একবার আমার কথা শোন । তোর কাছে খুব ছোট ঘটনা মনে হতে পারে, কিন্তু তুই আমাকে যা করতে বলে গেছিস তা পন্ড করার জন্যে যথেষ্ট । প্লিজ লিসেন ।

চঞ্চল – কেন, কি হয়েছে?

পূর্ণ – আমি একটা খুব অন্যায় করে ফেলেছি । খাবার টেবিলের উপর অমলা ওর ডায়েরীটা ফেলে গেছিল, আমি খুলে পরে ফেলেছি ।

চঞ্চল – ওহো , ঠিক আছে । আবার যেখানে ছিল সেখানে রেখে দে । তাহলেই হল ।

পূর্ণ – হতো, কিন্তু আমি ওর একটা পেজ প্রায় ছিঁড়ে ফেলেছি, একেবারে দুমড়ে মুচড়ে গেছে ।

চঞ্চল – অ্যাঁ, সে কি, কিভাবে? কেন?

পূর্ণ – সেটাই তো বলছি । আসলে ডায়েরীতে আমার বিষয়ে খুব খারাপ কিছু মন্তব্য ছিল, পড়তে পড়তে নিজেকে সামলাতে পারি নি । আমি পাতাটাকে একেবারে দুমড়ে ফেলেছি ।

চঞ্চল – হা,হা,হা , অমলা জানতে পারলে কি হবে জানিস ?

পূর্ণ – কি হবে?

চঞ্চল – সি উইল কাট ইওর বলস অফ!

পূর্ণ – উঃ! (লাফ দিয়ে নিজের দুটো হাত প্যান্টের সামনে নিয়ে আসে!) এমন নিশ্চিত হয়ে কি করে বলছিস? ও হয়তো এটাকে পাত্তাই দেবে না ।

চঞ্চল – তুই তাই ভাবিস? এক বছর আগে, আমি ওই ডায়েরীটা, মানে এর আগের বছরের সংস্করণটা খুলেছিলাম, ভুল করে । বসেছিলাম, ও রান্না করছিল, হাতের কাছে পড়েছিল, আমি অন্যমনস্কভাবে জাস্ট তুলে উলটে পালটে দেখছিলাম । ও দেখতে পেয়ে খেপচুরিয়াস । মাংস স্লাইস করছিল, হাতে এত বড় ছুরি – ছুরি নাড়িয়ে বলল – এত সন্দেহ আমাকে তোমার? ইউ আর নাউ স্নুপিং অন মী? আই উইল কাট ইওর বলস অফ! ঠিক এইভাবেই বলেছিল, এই একই অপরাধে । সেজন্যেই বললাম ।

পূর্ণ – তারপর কি হল?

চঞ্চল – না না কাটে তো আর নি, আমাকে ভয় দেখিয়েছিল মাত্র। তাতেই অবশ্য রক্ত ঠান্ডা হয়ে গেছিল। তবে এসব ও সহজে ছাড়ে না। আমি একবার ওর মোবাইলে এস এম এস দেখছিলাম বলে, ও সেটাকে পাস ওয়ার্ড প্রোটেক্ট করেই থামে নই, ওর ফেসবুক থেকে আমাকে আনফ্রেন্ড করে দিয়েছিল।

পূর্ণ – হাসব্যান্ড ওয়াইফের মধ্যেও এত গোপনীয়তা থাকে?

চঞ্চল – আহা, আমারটা ও দেখতে পারে, আমার জামার পকেটে কোন সিনেমার টিকেট পাওয়া গেল কিনা, আমার পার্সে কি কি আছে, এসব ও দেখতে পারে। বিয়ে করিস নি তো তাই জানিস না। কিন্তু ওর ব্যাগের ধারে কাছে গেলে – তুই কোনদিন কোন মেয়ের ব্যাগের ভেতর উঁকি মেরে দেখেছিস? আমি একবার চিরুনি খুঁজতে অমলার ব্যাগের মধ্যে উঁকি দিয়েছিলাম – আমারা বিয়ের পরে পরেই হানিমুনে গেছিলাম, তার প্লেনের বোর্ডিং পাসও ছিল, ভাবতে পারিস? (চঞ্চল দীর্ঘ শ্বাস ফেলে) বল কি ভালবাসে, ওই বোর্ডিং পাস আজ পনেরো বছরে কত ব্যাগ ঘুরে এই ব্যাগে জায়গা পেয়েছে! অথচ, তবুও এত খাণ্ডারনি হয়ে ঘুরছে?

পূর্ণ – তাহলে কি করব এখন? আমার কথাটা ভাব।

চঞ্চল – কি আর করবি? পাতাটাকে সোজা করার চেষ্টা কর। তারপরে জায়গার জিনিস জায়গায় রেখে দে, এমনভাবে রাখ যাতে ও বুঝতে না পারে।

পূর্ণ – হচ্ছে না, কিছুতেই পারছি না। তখন থেকে সোজা করার চেষ্টা করছি, হচ্ছেই না যে রে। ও ঠিক বুঝতে পারবে, একেবারে কুচকে মুচকে আছে।

চঞ্চল – পূর্ণ, দ্যাখ যা হবার হয়ে গেছে। এসব ছাড়। তুই কোথাকার হিরো এসেছিস যে তোর রেপুটেশন ম্যানেজ করতে হবে? তোর তো কিছু হারানোর নেই বাবা। তুই বরং আমার কথাটা ভাব। আমি এখানে সেন্ট্রাল ক্যারাক্টার, তুই নোস। ইউ আর ইন দ্য সিন ফর আ পারপাস।

পূর্ণ – তোর পক্ষে বলা সোজা। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে রে।

চঞ্চল – ফোকাস কর, ফোকাস। আগে আমার কথা শোন। এমন নয় যে যাদের কথা বললাম, অমলা তাদের সঙ্গে প্রেম করছে কিংবা করতে পারে। ইন ফ্যাক্ট ইট ইজ নট পসিবল। দে আর ইন দ্য নেক্সট রাং, আ ডিফারেন্ট অল্টিটিউড। আসলে ও ওদের কথা বলে, কারন ওর মতে ওরা জীবনে দাঁড়িয়েছে, ওরা যে জায়গায় পৌঁছেছে আমারও নাকি সেখানে পৌছান উচিত। আসলে বুঝতে পারছিস তো ? ও আমাকে ভালবাসে আর চায় আমি ওরকম জায়গায় পৌঁছে যাই। আমি জানি। জানি সেটা। কিন্তু এটা কি প্যাথেটিক একটা সিচুয়েশন নয়?

পূর্ণ – আমি কি করব চঞ্চল? আমার এখন ডায়েরীটা নিয়ে কি করা উচিত?

চঞ্চল – (চেঁচিয়ে) নিকুচি করেছে তোর ডায়েরীর। আমি কিচ্ছু জানি না, ব্যাস! তুই আমাকে হেল্প করতে এসেছিস, আমি তোকে হেল্প করতে আসি নি।ট্রাই হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট।(ফোন রেখে দেয়)

পূর্ণ – কি করবো এবারে? (বার ক্যাবিনেটের উপর নজর পরে) হ্যাঁ, আমি ড্রিঙ্ক করব । একেবারে মাতাল হয়ে যাবো, তারপর বলব যে মাতাল অবস্থায় পাতা ছিঁড়ে ফেলেছি । ইয়েস, সেটাই ভাল প্ল্যান।

(আবার ফোন আসে)

চঞ্চল – কিছু মনে করিস না, পূর্ণ। টেনসনে আছি তো, হঠাত চেঁচিয়ে ফেলেছিলাম।

পূর্ণ – ওকে, ওকে বুঝতে পারছি।

চঞ্চল – তাহলে আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা মনে আছে তো? ভুলে গেলি? দ্যাখ, তোর মনে আছে তো কি কারনে তোকে একা ছেড়ে আমি চলে এসেছি? দেখতে গেলে এই ঘটনায় তাতে লাভই হবে হয়তো।

পূর্ণ – কি লাভ হবে? ইফ সি কাট মাই বলস অফ, তাতে তোর কি ভাবে লাভ হতে পারে।

চঞ্চল – আহা সত্যি কি আর কাটবে? কিন্তু রাগ করবে, গালাগালি দিতে পারে। তোকে নিষ্কম্পুফ ভাবতে পারে।

পূর্ণ – ওই, ওইটাই তো লেখা ছিল আমার বিষয়ে।

চঞ্চল – দ্যাটস গুড , তাহলে তো ভালই করেছিস । নাথিং বেটার দ্যান আ প্রুফ! তাই এটা নিয়ে আর চিন্তা করিস না। কিন্তু একটা কথা শোন, মন দিয়ে শোন। একটা ব্যাপারে সাবধান।

পূর্ণ – কি ব্যাপারে।

চঞ্চল – গান নিয়ে কোন কথা নয়, কোন প্যাঁ প্যাঁ গান শোনা নয়।

পূর্ণ – মানে?

চঞ্চল – এই একটা ব্যাপারে ও তোকে টেনে এনে আমাকে ছোট করে, ওর ধারনা তুই খুব ভাল গান বুঝিস, চর্চা চালিয়ে গেলে নাম করতে পারতি ওই আমার মধ্যে যেরকম গ্রেটনেস দেখে আর কি, তোর মধ্যেও গান নিয়ে – তোকে প্রমিস করতে হবে গান নিয়ে এই দুদিনে কোন কথা বলবি না।

পূর্ণ – আচ্ছা বাবা, তাই হবে।

চঞ্চল – ব্যাস, এই ব্যাপারটা শুধু মাথায় রাখিস। এছাড়া তুই একদম বি ইয়োরসেলফ, ঠিক তুই যেরকম সেই রকম। শুধু গানের ব্যাপারে সাবধান। কোন গান চালাবি না, কিংবা গাইতে যাবি না, গুনগুন করেও না। ওইসব প্যানপ্যানানি গান শুনলেই ও কিরকম গলে যায়, তাহলেই আমাদের স্ট্র্যাটেজি আর কাজ করবে না।

পূর্ণ – ঠিক আছে । এমনিতেও অমলা বাড়ি ফিরে ডায়েরীর এই অবস্থা দেখার পর আমার সঙ্গে বসে কথা বলবে আর গান শুনতে চাইবে বলে আমি ভাবতে পারছি না চঞ্চল। একমাত্র সম্ভাবনা মেশিন গান।

চঞ্চল – আচ্ছা, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, আহা তোর প্রব্লেমটা সলভ করার জন্যেই। শুনবি আমার প্ল্যানটা, বলি?

পূর্ণ – বল, আমি শুনছি।

চঞ্চল – দ্যাখ আমাদের পাশের ফ্ল্যাটে এক পাঞ্জাবী কাপল থাকে – হরপ্রিত অ্যান্ড হারবিন্দার। ওরা হঠাৎ হঠাৎ আমাদের ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হয়। নো প্রায়র ওয়ারনিং অর এনিথিং। আর আসলেই বসে যাবে, মসালা চা খাবে এইরকম আর কি। নেবার, তাই কিছু বলা যায় না। সঙ্গে থাকে ওদের কুকুর গোগো। বদমাশ, নোংরা, গন্ধ একটা কুকুর। কিন্তু হরপ্রিত আর হারবিন্দারের জন্য ও ওদের বাচ্চার মত।

পূর্ণ – এখন কি এসব গল্প শোনার সময়, বল?

চঞ্চল – কাজের কথাই বলছি, শোন আগে। গোগো এসে সিস্টেমেটেক্যালি আমাদের বসার ঘরটা ধংস করে দেয়। হয়তো

ফটো স্ট্যান্ড থেকে ফটো ফেলল, ল্যাম্প উলটে দিল, বইয়ের পাতা খেয়ে ফেলল। মাস ছয়েক আগে কি হল, আমাদের একটা কফি টেবল বুক ছিল, অমলার ফেভারিট। গোগোবাবু এসে ওর লালা দিয়ে পুরো বইটা এমন ভেজালেন, বইটা ফেলে দিতে হল। ওদিকে হারবিন্দার কু কু করে বলছিল, ও ডার্লিং, গুসসা কায়কু? ডরনা নেহি হ্যায়। ভাব একবার কার ভয় পাওয়ার কথা কে পাচ্ছে। আর গুসসায় তো অমলা কুত্তার বাবা। জানে নাতো অমলা দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করে যাচ্ছে। কিন্তু ভাবছি কবে বার্স্ট করবে একদিন, আর গোগোর ফুল ফ্যামিলি কোথায় উড়ে চলে যাবে।

পূর্ণ – চঞ্চল, কলেজ জীবনে অমলা কি মিষ্টি আর নরম স্বভাবের ছিল। ও কবে থেকে এরকম তেজিয়াল হয়ে গেল?

চঞ্চল – এটা একটা মিস্ট্রি পূর্ণ, মেয়েদের লাইফ সাইকেলটা উল্টো। তারা কিভাবে প্রজাপতি থেকে শুঁয়োপোকা হয়ে যায় আর সারা জীবন হুল ফোটায় এটা নিয়ে বহু গবেষনা হয়েছে, আমদের বিষয় এখন সেটা নয়। আমাদের বিষয় হল গোগো। কিভাবে গোগোর রেপুটেশনকে ইউটিলাইজ করবি সেটা ভাব।

পূর্ণ – হ্যাঁ, হ্যাঁ , আমি বুঝতে পারছি। ইন ফ্যাক্ট আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু কিভাবে ব্যাপারটাকে সাজানো যাবে –

চঞ্চল – ঠিক আছে, আমি বলে দিচ্ছি। বলবি, বেল বাজল, তুই দরজা খুললি। এই দুজন দরজায় দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে গোগো। এরা ঢোকার আগেই গোগো লাফ দিয়ে ঢুকে গেল। ধর ধর বলে ধরার আগেই সারা ঘরে একবার পাক মেরে জিনিশ পত্র উলটে, টেবলে রাখা ডায়েরির পাতা খেয়ে – হ্যাঁ শোন তুই ওই পাতাটায় একটু তোর লালা ফেলে দিস, টু মেক ইট সিম রিয়াল। কি হল, গল্পটা জমছে না?

পূর্ণ – না, না চঞ্চল, বেশ ভাল জমছে। আমি জাস্ট চারদিকটা মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি। মনে কর যদি আজকেই অমলা ফেরার পর পরই এই শিখ ফ্যামিলি সত্যি সত্যি এসে উপস্থিত হয়। তখন ?

চঞ্চল – হতে পারে, পারে না তা নয়। তবে ওরা রোজ তো আসে না, হয়তো মাসে একবার। এই পনেরো দিন আগেই এসেছিল আর গোগো অমলার বোন চায়নার চায়ের কাপ চুরচুর করে গেছে। তাই মনে হয় না সে ঘা পুরোপুরি সারার আগে আর আসবে। তাই গল্পের ফাঁক না খুঁজে, ফাঁক ভরাট করার চেষ্টা কর।

পূর্ণ – দ্যাখ একটা কথা ভাবছি, গোগো মানে এই কুকুরটা এল আর সারা ঘরের মধ্যে শুধু ওই ডায়েরীটার ঠিক ওই পাতাটাই খেল, এটা কিরকম বাজে বাংলা সিনেমার প্লট হয়ে যাচ্ছে না?

চঞ্চল – পূর্ণ, ওটাই তো বলছি। ফাঁকগুলো ভরাট করার ব্যাবস্থা কর। সেটাও কি বলে দিতে হবে? ইউজ ইওর ইমাজিনেশন। ভাব ওরকম একটা নচ্ছার কুকুরের বাচ্চা ঘরে ঢুকে গেলে কি কি করতে পারে। একটা আম বাগানের উপর দিয়ে কাল বৈশাখী চলে গেলে কী হয়? ভাব আর ঘরটাকে সেই লেভেলে নিয়ে যা। বি রুথলেস লাইক গোগো। দ্যাখ আমি আর কথা বলতে পারছি না, আমার প্লেন ছাড়বে, আমি এবার ফোন রাখছি । পৌঁছে গিয়ে আবার কথা বলব।

(পূর্ণ ফোন রেখে প্রথমে টেবল ল্যাম্প উল্টে দেয়, সাবধানে সত্যিকারের নষ্ট না করে। একটা ফুলদানিকে উল্টে ফুলগূলো চারপাশে ছড়িয়ে দেয়। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট উল্টে দিল। তারপর ডায়েরির পাতাটা আরও ছিড়ে, তাতে নিজের মুখের লালা ফেলে ভেজালো। সব খুব ধীরে ধীরে হতে থাকে, আলো কিছুটা কমে আসে। এরপর পূর্ণ আবার গিয়ে সোফায় শুয়ে পরে, আলো আরও কমে যায়। ফোন আসে)

পূর্ণ – হ্যালো!

অমলা – পূর্ণ, ঘুমাচ্ছিলে বুঝি? সরি তোমাকে ডিস্টার্ব করলাম। আসলে তোমাকে আরও বার কতক ফোন করেছি, কিন্তু পাই নি। তাই খুব চিন্তা হচ্ছিল তোমার জন্য জানো?

পূর্ণ – আহা এত কেন চিন্তা করছো অমলা? কি হয়ে যাবে আমার? আমি তো জাস্ট ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

অমলা – দেখেছো আমার অবস্থা। তুমি হয়তো কতদিন রেস্ট পাও নি। ট্রেনে তো নিশ্চয় ঘুম হয় নি। আর যেই তুমি দু চোখের পাতা এক করেছো, আমি তোমার ঘুম চটকে দিলাম। শেম অন মি।

পূর্ণ – না না তুমি একটু বাড়াবাড়ি করছো অমলা। ঘুম কিছু দুস্প্রাপ্য বস্তু নয়, শুয়ে থাকলে আপনিই এসে যাবে।

অমলা – ঠিক আছে তুমি ঘুমোও। আমি তোমাকে বরং আরও বেশি ঘুমাবার সময় দিচ্ছি। ইন ফ্যাক্ট, সেই জন্যেই আমি তোমাকে ফোন করেছিলাম। আসলে আমার না আরও ঘন্টা খানেক দেরী হবে। কি খারাপ যে লাগছে আমার, কি বলব। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই জানো, এই কাজটা নামিয়ে না আসলে আই উইল ফীল গিলটি।

পূর্ণ – এতে কিন্তু কিন্তু করবার কি আছে? আমি না হয় ছুটিতে, তোমরা নয়। কাজ কর্ম সব চুকিয়ে তবেই এসো। আমি তো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি না।

অমলা – তুমি কি সুইট পূর্ণ! এভার সো অ্যাকোমডেটিভ। বাট লেট মি প্রমিস, ওয়ান্স আই অ্যাম ব্যাক, আমরা অনেক মজা করব।

(ফোন রেখে দেয়)

(পূর্ণ বসতে যায় আবার ফোন আসে)

পূর্ণ – হ্যালো।

চঞ্চল – কি খবর? অমলা ফিরে এসেছে? সব রেডী ছিল তো?

পূর্ণ – না রে চঞ্চল, আমার মনে হয় না এতে কোন কাজ হবে। অমলা এখনও আসে নি, কিন্তু ও ঠিক ধরে ফেলবে।

চঞ্চল – মানে, কিছু করিস নি তুই? এত সব বুঝিয়ে বলে দিলাম আর কিছু না করে হাতে হাত দিয়ে বসে আছিস?

পূর্ণ – না, না সেসব করেছি। কিন্তু ধরে ফেলবে রে, অথেন্টিক লাগছে না। অমলার চোখ সাংঘাতিক, কুকুরের কাজ নয় সেটা ঠিক বুঝে যাবে।

চঞ্চল – আমি বুঝতে পারছি তোর দিকটা। তুই ভাবছিস এসব আমাদের জিনিস, নষ্ট করতে গায়ে লাগছে। নিশ্চয় জিনিসগুলো ধাক্কা দিতেও পারিস নি যথেষ্ট জোরের সাথে। আয় আমি তোকে গাইড করছি। ঘরে অনেকগুলো জিনিস আছে, আমি অনেকদিন থেকে নিজেই নষ্ট করতে চাইছিলাম। এখন এই সুযোগটা কাজে লাগাই বরং। দ্যাখ ঐ শেলফের নিচের তাকে একটা লাফিং বুদ্ধার স্ট্যাচু আছে। ওটা সন্দীপ সান্যাল চায়না থেকে এনে গিফট করেছিল। তুই ওটাকে গুঁড়ো করা দিয়েই শুরু কর। তাছাড়া অত বাছাবাছির কি আছে, যা পাচ্ছিস হাতের কাছে ছুড়ে ফেল মাটিতে।

পূর্ণ – চঞ্চল, তুই একটু উত্তেজিত হয়ে গেছিস, একটু শান্ত হ এবার।

চঞ্চল – হ্যাঁ, আমি উত্তেজিত। কারন আমার বাড়ি জাঙ্কে ভরে গেছে, ইভেন আওয়ার ম্যারেজ ইস জাঙ্ক নাও। সব কিছু আজ ক্লান্ত ধংসস্তূপ। ওই যে লাল রঙ্গের সোফাটা, ওটা দিয়েই শুরু কর বরং।

পূর্ণ – আরে ওটাতে তো আমি শুয়েছিলাম এতক্ষণ।

চঞ্চল – আরও ভালো, ওর কভারটাকে খুবলে তুলে ফেল আর ভেতরের স্পঞ্জগুলো এদিক ওদিক উড়িয়ে দে।

পূর্ণ – চঞ্চল, মাথা গরম হয়ে গেছে তোর। আমার মনে হচ্ছে তুই আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে আসলে আমাকে তোর রাগ আর ফ্রাস্ট্রেসন দেখানোর অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছিস। আমার সেটা একদম ভাল লাগছে না।

চঞ্চল – না, একদম না, একদম ভুল ধারনা তোর। আমি তোকে হেল্প করছি, আর আমি জানি আমার প্ল্যান ঠিক কাজ করবে। অমলা গোগোকে একদম পছন্দ করে না। হরপ্রিত আর হরবিন্দারকে তো দুচক্ষে দেখতে পারে না। তাই এরকম কিছু একটা ঘটলে ওর রাগটাকেই আর একটু উস্কে দেওয়া হবে। আর শোন, যেটা আমার মাথায় এল ফ্লাইটে আসতে আসতে। দারুন একটা প্ল্যান। যেটা হলে অমলাকে কনভিন্স আর করতে হবেনা, নিজের থেকেই বুঝে যাবে। আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল, দ্য সিক্রেট ইনগ্রেডিয়েন্ট। ভালই হয়েছে অমলা এখনও এসে পৌঁছায় নি। তোর হাতে আর কত সময় আছে?

পূর্ণ – ঘন্টাখানেক তো হবেই =

চঞ্চল – ব্যাস, তাহলে তো হয়েই গেল।ভাল করে শোন। গন্ধ, তোকে গন্ধ তৈরী করতে হবে, যেন পুরো বাড়িটায় একটা কুকুরের গন্ধ ভেসে বেড়ায়। অমলা আসবে আর ঘরের বাতাসে গোগোর গন্ধ ভেসে ভেসে ওর নাকে গিয়ে ধাক্কা মারবে। তোকে কিছু বলতেও হবে না । ঐ গন্ধ নাকে নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখবে স্মাইলিং বুদ্ধা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে মাটিতে লুটচ্ছে। সারা ঘরে স্পঞ্জের ফুলঝুরি, নিজেই সব বুঝে যাবে।

পূর্ণ – চঞ্চল, যা তা বকে চলেছিস। আমাকে বল কুকুরের গায়ের গন্ধ আমি কোথা থেকে পয়দা করব? তোর কি কুকুরের গায়ের গন্ধের পারফিউম আছে?

চঞ্চল – ডোন্ট বী সিলি। আমি জানি কিভাবে করবি। আমি আর তরুন ক্লাস এইটে থাকতে এই গন্ধটা তৈরী করেছিলাম। ওর রেসিপি ছিল, কিন্তু আমি সেটাকে রিফাইন করে একেবারে এক্সাক্ট স্মেলটা এনেছিলাম।

পূর্ণ – কিন্তু কেন করেছিলি?

চঞ্চল – কেন রিফাইন করলাম? আসলে ওর রেসিপিতে কিরকম একটা বাঁধাকপি বাঁধাকপি গন্ধ ছাড়ছিল, ঠিক কুকুরের গন্ধ নয়, সেই জন্যে।

পূর্ণ – আহা, আমি বলছিলাম কেন বানাতে গেলি? যাক ছাড় সে কথা । তুই বরং বল কি করে করতে হবে। আবার বলিস না যে আমাকে এখন বাইরে থেকে কেমিস্ট্রি ল্যাবের উপকরণ কিনে আনতে হবে।

চঞ্চল – নট অ্যাট আল। তুই খাতা কলম নিয়ে বস, আমি বলছি। নিয়েছিস? হ্যাঁ শোন। একটা মিডল সাইজড সসপ্যান নিবি। রান্নাঘরে খোঁজ, পেয়ে যাবি। লিটার দুয়েক জল দে। জল গরম হলে তাতে ছাড় চিকেন স্টকের দুটো কিউব, তেজ পাতা, এক টেবল চামচ জিরা পাউডার, ভিনিগার দুই টেবল চামচ। কটা গোটা গোল মরিচ ছড়িয়ে দে। এরপর এর মধ্যে একটা লেদার শু চড়িয়ে দে।

পূর্ণ – লেদার শু? কি যা তা বলছিস?

চঞ্চল – হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক শুনেছিস। লেদার শু। পুরো ডুবাবি না, সোলটা জলের বাইরে, নাহলে রাবার পোড়া গন্ধ হয়ে যাবে।

পূর্ণ – কোথায় পাবো এই সব?

চঞ্চল – কিচেন ক্যাবিনেটটা খুলে ফেল, সব লেবেল করা থাকে, পেয়ে যাবি। আর শু ক্যাবিনেটটা খোল। ওখানে দেখবি একটা বুট আছে । কালো ছিল, কিন্তু এখন ধুসর হয়ে গেছে। ওটা নিয়ে নে।

পূর্ণ – কিন্তু চঞ্চল –

চঞ্চল – কোন, ইফ, বাট, কিন্তু নেই পূর্ণ। যা বলছি করে যা, পথে নেমে নো লুকিং ব্যাক। আমার আর সময় নেই। রাখছি। যা বলে দিলাম জাস্ট ব্লাইন্ডলি ফলো করে যা। আর হ্যাঁ, মনে রাখবি গান নিয়ে কোন কথা নয় কিন্তু।

(পূর্ণ কিচেনে সসপ্যান চাপায়, শু র্যাক থেকে জুতো চুজ করে নিয়ে যায়। তারপর ফোন করে)

পূর্ণ – হ্যালো ক্যান আই স্পীক টু মিসেস অমলা ব্যানার্জী? নো, আই নীড টু টক টু হার ইমিডিয়েটলি। ইফ সি ইজ ইন আ মীটিং, কল হার আউট। দিজ ইজ আর্জেন্ট।

অমলা – কি ব্যাপার পূর্ণ, কিছু হয়েছে? কি হয়েছে, আমায় বলো।

পূর্ণ – না, কি হবে? কিছুই হয় নি। আমি ফোন করেছিলাম জানার জন্য আর কতক্ষণ লাগবে তোমার আসতে।

অমলা – এই জন্যে? তোমার গলাটা কেমন অদ্ভুত শোনাচ্ছে পূর্ণ, কি হয়েছে ঠিক করে বল।

পূর্ণ – কি আবার হবে ? আমি জাস্ট বোঝার চেস্টা করছি কখন তোমাকে এক্সপেক্ট করা যায়।

অমলা – রাগ করেছো খুব, তাই না? আই অ্যাম সো সো সরি। জানো, আজকেই এমন একটা জটিল কাজ নিয়ে ফেঁসে গেছি না। প্লিজ আর একটা ঘন্টা ধৈর্য ধরো, তারপর আমি এসে যাবো। তুমি কিন্তু আবার রান্নাঘরে যেও না, আই উইল টেক কেয়ার অব এভ্রিথিং।

পূর্ণ – ওকে, ওকে তাড়াহুড়ো করার কোন দরকার নেই। শুধু জেনে নিলাম তোমার কতক্ষণ সময় লাগবে। টেক ইওর ওন টাইম। (ফোন রেখে দেয়)

(পূর্ণ এবার রেসিপি অনুযায়ী কুকুরের গন্ধ বানাতে শুরু করে। এমন কি বানাতে বানাতে আনন্দে সিস দিতে শুরু করে , তারপর গুনগুন করে গান। বোঝা যায় ওর দুশ্চিন্তা এখন অনেক কমে এসেছে। আবার ফোন আসে, এবার চঞ্চল)

পূর্ণ- হ্যালো

চঞ্চল – পূর্ণ, তোকে একটা কথা বলা হয় নি। আসলে খুব খারাপ লাগছে যে তোর কাছ থেকে এত বড় উপকারটা নিচ্ছি অথচ সব কথাগুলো ঠিকঠাক বুঝিয়ে তোকে বলি নি এখনও।

পূর্ণ – দ্যাখ এটা যদি কুকুরের গন্ধের রেসিপি নিয়ে হয়, তবে বেশ দেরী হয়ে গেছে। কারণ জল ফুটছে । তবে যদি কোন এক্সট্রা হারব দিতে হয়, তাও হয়তো পারব, কিন্তু তার বেশি সম্ভব হবে না।

চঞ্চল – নারে পূর্ণ, আমি এর আগে তোকে সব সত্যি কথাগুলো বলিনি। আসলে অনেক সময় বলা কঠিন হয়ে যায়। তুই জিজ্ঞেস করেছিলি আমার কেউ আছে কিনা, আমি না বলেছিলাম। আসলে সেটা মিথ্যা বলেছিলাম।

পূর্ণ – তার মানে তুই এখন বিজনেস ট্রিপের নাম করে সেই মেয়েটাকে নিয়ে, ছি ছি চঞ্চল। তুই এত নিচে নেমে গেছিস আর মিছেমিছি অমলাকে-

চঞ্চল – না, না, না। ভুল ভাবছিস। একটা মেয়ে আছে, ইন হার আরলি থারটিস। কিন্তু অন্য রকম। ভেরি আইডিয়ালিস্টিক, চিলড্রেন এডুকেশান নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে, ডেভেলয়াপিং কান্ট্রির প্রবলেম নিয়ে কনসার্ড থাকে। ভেরি সুইট। ওর এই চিন্তাধারা, সমাজ সচেতনতা দেখে আমি অ্যাট্রাক্টেড হয়েছিলাম। আমাদের কলেজ জীবনের কথা মানে পড়িয়ে দেয়, যখন আমরাও এরকম ছিলাম।

পূর্ণ – চঞ্চল, তোকেতো কখনও আইডিয়ালিস্ট ছিলি বলে মনে পড়ে না। তার বদলে, কিছু মনে করিস না, তোকে সব সময়েই নিজের দিকটা গুছিয়ে নেওয়া ক্যারিয়ার ওরিয়েন্টেড মনে হয়েছে।

চঞ্চল – ওকে, ওকে, না হয় তোকে ছাড়া আমরা সবাই স্বার্থপর, নিজের আখের গুছাতে ব্যাস্ত ছিলাম। কিন্তু তবুও কোথাও একটা, মনের ভিতরে অন্য কেউ একটা ছটফট করে তো কিছু একটা করার জন্য। বেরোবার পথ পায় নি এতদিন। কিন্তু এবার –

পূর্ণ – এসব কবে থেকে চঞ্চল? কতদিন ধরে চলছে?

চঞ্চল – কি কবে থেকে পূর্ণ?

পূর্ণ – এই যে এই অ্যাফেয়ারটা?

চঞ্চল – অ্যাফেয়ার? কোথায় অ্যাফেয়ার? আমি ওর সঙ্গে একটা লাঞ্চ পর্যন্ত করিনি, সেক্স তো দুরের কথা। শুধু, দেখা করেছি নিয়মিত।

(পূর্ণ একবার রান্নার গন্ধ শুঁকে আসে)

পূর্ণ – গন্ধটা ভাল বেরিয়েছে কিন্তু। কিন্তু,তার মানে কি? কিভাবে ওর সঙ্গে দেখা করতিস তাহলে?

চঞ্চল – ওয়েল, বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট। আই কেপ্ট মেকিং অ্যাপয়েন্টমেন্ট টু হার।

পূর্ণ – ও, তার মানে কলগার্ল?

চঞ্চল – না, না। বললাম না কোন শারীরিক ব্যাপার ছিল না। আসলে ও হচ্ছে ডেন্টিস্ট। আমি খুব ঘন ঘন ওর কাছে দাঁত দেখাতে যাই। কখনও ব্যাথা, কখনও ক্লীনিং, ফ্লস, গামে রক্ত এইসব বিভিন্ন বাহানায়। মানে রিজণ তৈরী করে নিতাম। শেষ অবধি অমলা ধরে ফেলল রে। (কান্নার শব্দ) ধরে ফেলল, কারন আমি এত ঘন ঘন যাচ্ছিলাম...

পূর্ণ – চঞ্চল, তোকে একটা কথা বলি। তুই শেষবার কথা বলার পর, আমি নিজেকে অনেক কষ্টে টেনে তুলেছি। নিজেকেই করতে হয়েছে। আর আমার মনে হয়, তোকে নিজের সঙ্গে সেটাই করতে হবে। তুই ফিরলে আমরা না হয় এই ব্যাপারে আরও কথা বলব। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কাছে এক ঘন্টা সময় আছে। আমার গন্ধ তৈরী, এখন আমি গোগো সেজে ঘর তছনছ করব। বুঝতেই পারছিস, আই অ্যাম অন টপ অফ মাই রেস্পন্সিবিলিটি।

চঞ্চল – বা, বা দারুন!

পূর্ণ – হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি এই কুকুর বিষয়ক ব্যাপারটা পুরো সামলে নেবো। তার পর অমলা আসলে বলব, দেখো আমাকে দেখো। আমি পূর্ণ, আমার কি করুন অবস্থা। শুধু আমি নই, চারদিকে দেখলেই বুঝবে সবারই এরকম করুন অবস্থা। শুধু একমাত্র ব্যাতিক্রম হল চঞ্চল। তুমি লাকি, কারণ চঞ্চল অন্যরকম, অন টপ অফ হিজ লাইফ।

চঞ্চল – যে ভাবে বলছিস, ইট সাউন্ডস সো আনন্যাচারাল। মনে হচ্ছে আমাকে উপহাস করছিস।

পূর্ণ – না রে বোকা, এইভাবে সোজাসুজি হয়তো বলব না। জানি সেটা , তবে সারমর্ম এটাই হবে। ছেড়ে দে আমার উপরে। শান্ত হ, আমি সব সামলে নেবো। বাই। (ফোন রেখে দেয়। রান্নাঘরে উঁকি দেয়, নাক উচু করে গন্ধ শোঁকে।) নাঃ, গন্ধটা বেশ ভালই জমেছে । কিন্তু চঞ্চলের কথা ধরে কাজ করলে কি ঘরটা ঠিক কুকুরের কান্ড বলে মনে হবে? আসলে, আসলে, হ্যাঁ ঠিক তাই (হঠাত চার পায়ে কুকুরের ভঙ্গিতে হামাগুড়ি দেয় পূর্ণ।) দেখেছো, তাই বলে না? চঞ্চল যে সব

টার্গেট বলেছে সব ভুল। দু পায়ে ছ ফুট উঁচু থেকে দেখা পৃথিবী আর তিন ফুটিয়া গোগোর জগদ্দর্শন তো এক হতে পারে না। কুকুরের হাবভাব ফলো না করলে এই কাজটা ঠিকঠাক হবে না। (পূর্ণ চার পেয়ে কুকুরের মত ছুটে গিয়ে টেবিলের উপর হামলে পরে পড়ে থাকা বইয়ের পাতা দাঁত দিয়ে ছেড়ে। কুকুরের মত জিভ বের করে লালা ছড়ায়। এরকম সময়ে পিছনে অমলার প্রবেশ। পূর্ণকে দেখে অবাক বিস্ময়ে মুখে হাত চাপা দেয়। পূর্ণ এবার দৌড়ে টেবিল ল্যাম্পের কাছে গিয়ে কুকুর যেভাবে ল্যাম্প পস্টের গায় এক পা তুলে পেচ্ছাপ করে সেভাবে পা তুলে ল্যাম পোস্টটাকে ধাক্কা মেরে উলটে দেয়। তারপর মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে ধংস করতে গিয়েই দেখতে পায় অমলা দাঁড়িয়ে। থমকে চার পায়ে দাঁড়িয়ে থাকে পূর্ণ। বুঝতে পারে না এবার কি করবে? অমলা এগিয়ে এসে একটু ঝুঁকে পূর্ণর কাধে হাত রাখে)

অমলা – পূর্ণ, আমি এসে গেছি। চলো দুজনে সোফায় বসে কথা বলি?

পূর্ণ – এটা অন্যায় অমলা, ঘোরতর অন্যায়। আমি একটু আগেই ফোন করে জিজ্ঞেস করেছি, তুমি তখন মিটিঙ্গে যাচ্ছিলে। বললে আরও এক ঘণ্টা লাগবে।

অমলা – সেটা ঠিক। কিন্তু তোমার ফোন কলের পরেই বুঝতে পারলাম আমার আসাটা দরকার, ভীষণ জরুরী।

পূর্ণ – জরুরী, কেন কি হয়েছিল? অমলা, আমার কি হয়ে গিয়েছিল যে তোমাকে সব কাজ ফেলে দৌড়ে আসতে হল?

অমলা – তোমার ফোন কল, পূর্ণ । আমি শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম কিছু হয়েছে। ইট ওয়জ লাইক অ্যান এসওএস।

পূর্ণ – বকোয়াজ! এসব কিচ্ছু নয়। আমি শুধু জানতে চাচ্ছিলাম।

অমলা – (রাগতে গিয়ে নিজেকে সামলে নেয়) ওহ পূর্ণ!

পূর্ণ – আমি জানি আমি একটু নোংরা করে ফেলেছি ঘরটা, মাই ক্লামসিনেস। আমি পরিষ্কার করতে শুরু করেছিলাম, তুমি না এসে পড়লে সেটা করেও ফেলতাম।

অমলা – ওসব কথা ছাড়ো পূর্ণ । কিচ্ছু হয়নি এতে। তুমি একটু শান্ত হয়ে বসো এখানে এসে।

(পূর্ণ মেঝে থেকে উঠে সোফায় এসে বসে ।)

পূর্ণ – অমলা, আমি জানি এটা তোমার বাড়ি, আমিই বাইরের লোক। কিন্তু এভাবে নিঃশব্দে ঢোকার দরকার ছিল কিছু? বলতো যারা বাড়িতে আছে তাদের কত চমক লাগতে পারে?

অমলা – আমাদের বাইরের বেলটা কাজ করছে না কদিন। আমি বাইরে থেকে দরজায় টোকা মেরে সাড়া পেলাম না। তখন আমার চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকেছি। কিন্তু কি হবে ওসব কথা বলে। ছাড়ো না সব। ভুলে যাও কি হয়েছিল। আমি তো এসে গেছি। আমরা দুজনে আছি, একটা সুন্দর সন্ধ্যা কাটাতে পারি। চা খাবে, বানাই? (উত্তরের অপেক্ষা না করে অমলা কিচেনে যায়, একটা চমকে যাবার গলার আওয়াজ) এটা কি পূর্ণ? (অমলার হাতে সস্প্যান, ধোঁয়া উঠছে, বাইরে থেকে জুতোর কিছুটা বেরিয়ে আছে, লেস ঝুলছে। তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে পূর্ণর দিকে তাকায়) নতুন কোন রেসিপি বোধ হয়? আমি বলেছিলাম না রান্না করার দরকার নেই কোন, আমি তোমাকে রান্না করে খাওয়াব। কেন মিছিমিছি করতে গেলে এসব? একি, এটা তো জুতো! (হাসি) এমা এবার বুঝেছি, দুপুরে আমি কোন রান্না করে রাখিনি বলে রাগ হয়েছিল তোমার? সেরকমই ছেলেমানুষ রয়ে গেলে।

পূর্ণ – আমি জানি, যেটা আমি করেছি সেটা এক্সপ্লেন করাও যেমন মুশকিল আমার পক্ষে, তোমার জন্যও বোঝা খুব কঠিন। কিন্তু এসব হয়েছে এই ডায়েরীর জন্য, এই যে এখানে। হঠাত ভুল করে খুলে ফেলেছিলাম, তারপর এখানে আমার বিষয়ে

কিছু কথা লেখা ছিল দেখে নিজের অজান্তেই গোটা কয়েক পাতা দুমরে মুচড়ে দিই। এই, এই ভাবে –

অমলা – ও, এই ডায়েরীটা? এটা নেহাতই টু ডু লিস্ট আমার। এমন কিছুই থাকে না এতে। যদি কক্ষণো কিছু লিখেই থাকি, দ্যাট ডাস নট কাউন্ট। এই ডায়েরী ছিঁড়ে গেলেও কিচ্ছু হবে না। এ নিয়ে এতো ভেবো না।

পূর্ণ – কিন্তু চঞ্চল যে বলল তুমি খুব রেগে যাবে?

অমলা – চঞ্চল বলল তোমাকে যে আমি এত ছোট একটা ব্যাপারে রেগে যাবো?

পূর্ণ – হ্যাঁ, গত বছর নাকি এরকমই কিছু ও করেছিল। আর তুমি বলেছিলে, ইউ উইল কাট হিস বলস অফ!

অমলা – যাঃ! এরকম কক্ষণো কিছু হয় নি। (একটু ভাবে) হয়তো বলেছিলাম, কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপারে। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। গত বছর চঞ্চল কিছুটা উদাস ছিল কোন কারনে একদিন। হঠাৎ বলল, অমলা, আমি যদি সুইসাইড করি তুমি কি করবে? ইয়ারকি মেরেও এসব কথা বললে কার ভাল লাগবে? তখনই বলেছিলাম বোধ হয়।

পূর্ণ – কিন্তু সুইসাইড করলে ওটা কি ভাবে করবে – মানে সয়িঙ্গ হিস বলস অফ? ওটা সুইসাইডের আগে না পরে?

অমলা – পূর্ণ – ওটাতো একটা কথার কথা, বলার ভঙ্গী। আমি বলতে চাইছিলাম, চঞ্চল এরকম করতে চেষ্টা করলে আমি কত রেগে যাবো, ও আমার কাছে কি। আচ্ছা ছাড়ো এসব কথা। খাবে তো? আমি কাল রাতে বাটার চিকেন বানিয়েছিলাম, পুরোটাই প্রায় রয়ে গেছে, দুটো রুটি সেঁকছি। খাবে?

পূর্ণ – কালকে করেছ, খাওনি কেন?

অমলা – সে এক তুলকালাম, চঞ্চলের সঙ্গে। যথারীতি দুজনে না খেয়ে শুয়ে গেলাম। ওসব হয়, সব সংসারে, বিয়ে তো করলে না, কি আর বুঝবে।

পূর্ণ – চঞ্চল কিন্তু তোমাকে এখনো খুব ভালবাসে অমলা, খুব!

অমলা – জানি, জানি। বলো কি নেবে? বিয়ার? ওয়াইন না হুইস্কি?

পূর্ণ – দাও, ঠান্ডা বিয়ার খেয়ে একটু জুড়োই।

(অমলা বেরিয়ে যায়, ফিরে আসে হাতে একটা বিয়ারের বোতল, অন্য হাতে ওয়াইনের গ্লাস। বিয়ার পূর্ণর হাতে দেয়।)

অমলা – সত্যি অদ্ভুত একটা দিন ছিল আজ। শুধু কাজের জন্য নয়, কাজ তো ছিল খুবই। কিন্তু এই চঞ্চল চলে যাচ্ছে। ভেবো না আমার সেটা খুব ভাল লাগছিল। এমনিতেই একটু মন কষাকষি চলছিল, তোমার কাছে আর কি লুকবো। এই রকম অবস্থায় ওর চলে যাওয়া, মীমাংসা হওয়ার আগেই। ভাল লাগে? তারপর তোমার এমন মানসিক অবস্থা, এইভাবে নিজেকে –

পূর্ণ – আরে না না, আমার বিষয়ে যা ভাবছ, ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। তবে যেটা বলছিলাম, চঞ্চলের সাথে এসেই যেটুকু কথা হল, ও কিন্তু তোমাকে ভীষণ ভালবাসে।

অমলা – বোগাস!

পূর্ণ – না, না সত্যি।

অমলা – চঞ্চল আমার বিষয়ে কি ভাবে, আমি জানি।

পূর্ণ – ভুল, সব ভুল ধারণা তোমার।

অমলা – আচ্ছা ? কি করে জানলে? ওর সঙ্গে তোমার বুঝি রেগুলার কথা হয়।

পূর্ণ – না, তা তো নয়। কিন্তু আজ লাঞ্চের সময় কথা হচ্ছিল। ওকে খুব ডিসটার্বড দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম। যা শুনলাম বুঝলাম তোমাদের কোন কারনে মন কষাকষি চলছে। কিন্তু এটাও বুঝলাম চঞ্চল তোমাকে খুব ভালবাসে।

অমলা – কে কাকে কি ভালবাসে কে বলতে পারে। এসব কথা ছেড়ে গান শোনাও না একটা, কতদিন তোমার গান শুনি নি।

পূর্ণ – গান? সে সব আমি কবে ছেড়ে দিয়েছি। কোথায় গাই আর। ভালই লাগে না ।

অমলা – কেন তোমার আবার কি হল? আমার না হয় মনের মত গান শোনা বন্ধ, কারণ চঞ্চল ওসব গান শুনতে ভালবাসে না। কিন্তু তুমি, তোমার কি হল? তোমার তো আর কারোর সঙ্গে মানিয়ে চলার নেই।

পূর্ণ – কাজ, দশ রকমের কাজের মধ্যে জড়িয়ে থাকি। গান করার সময় কোথায়?

অমলা – আশ্চর্য ব্যাপার, গান কি কেউ ভোলে নাকি আবার? নাকি সময়ের সঙ্গে মনের গান শুকিয়ে যায়?

পূর্ণ – কত বছর তো হয়ে গেছে, মানুষ তো বদলায়।

অমলা – তুমি বদলেছ? কি বদলেছে তোমার? যে বাউন্ডুলে ছিলে আছ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কোন পরিবর্তন হয় নি। শুধু গান গাওয়া বন্ধ করে দিয়েছ। স্ট্রেনজ! আচ্ছা, না হয় তুমি গাইবে না, শুনতে তো আর আপত্তি নেই। (অমলা উঠে গিয়ে গান চালিয়ে দেয়) চঞ্চলের মত তোমার আবার গানে অ্যালার্জি ধরেনি তো?

পূর্ণ – না, না অমলা। তা কেন। গানের সঙ্গে কত স্মৃতি ভেসে আসে। মন ভাল হয়ে যায়। আসো চুপচাপ বসে শুনি।

অমলা – আই অ্যাম সরি পূর্ণ। আমি আবার তোমার উপর চেঁচিয়ে ফেলেছিলাম। তোমার মানসিক অবস্থা এমনিতেই ভাল নয়, তার উপর-

পূর্ণ – না, না তা তে কি হয়েছে। কিচ্ছু না। তবে কি জানো অমলা চঞ্চল সম্বন্ধে তোমার কিছু ধারণা ভুল। ও খুব ভাল, আর সব চেয়ে বড় কথা তোমাকে খুব ভালবাসে।

অমলা – উফ তোমাকে আর চঞ্চলকে নিয়ে সালিশি করতে হবে না। এত বছর একসঙ্গে আছি, হাড়ে হাড়ে চিনি আমি ওকে। তবে তোমার কথা হয় তো সত্যি। আমরা তো আর সেই কচিটি নেই। দুজনেরই নিজের নিজে দোষগুন আছে। হয়তো চারপাশের আর সব বিবাহিত কাপলদের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা ভালই আছি। ভাল থাকা উচিত। কিন্তু আমরা কিছুতেই যেন তবু ভরাট নই, যা পেয়েছি তা তে সুখী নই। কেন কে জানে? যা চেয়েছিলাম, তাই তো পেয়েছি আমি চঞ্চলের মধ্যে।

(কথার গতি খুব ধীর) আবার ভাবি, কি চেয়েছিলাম সেটাও কি ঠিকঠাক জানি। শুধু কি জীবনে সাফল্য, টাকা পয়সাই চেয়েছিলাম? এই যে তোমার সঙ্গে বসে গান শুনছি, এটাও কি চাই নি? আর সাফল্যের কথা বললে, চার পাশে তাকাই, অন্যদের দেখি। আর ভাবি কি সাফল্যই বা পেলাম? যা পেলাম তার জন্য দামটা কি খুব বেশি দিলাম? বুঝতে পারছো আমার কথা পূর্ণ? আমি কি বোঝাতে পারছি? জীবন তো একটাই পূর্ণ, কিভাবে খরচ করেছি আর করছি – ভাবি না পাওয়ার পাল্লাটা কি ভারি হয়ে গেল?

পূর্ণ – বুঝি, বুঝি। আমারও কি মনে হয় না? এক ভাবে কাটিয়ে দিলাম জীবনটা। হিসেব নিকেশ কোনদিন করিনি । তা বলে হঠাৎ হঠাৎ মাথায় আসে না যে তা নয়।

অমলা – আসে তো? কখনো হয়তো কারোর সঙ্গে পরিচয় হয়, ভাল লাগে। হঠাৎ করে মনের মধ্যে কিছু একটা না পাওয়ার বেদনা কিংবা আরও কিছু পাওয়ার একটা আকাঙ্খা তৈরী হয়। হয় না? কিন্তু তখনই মনে হয়, নিজেকে মনে করাই আমি যার সঙ্গে আছি এরা কেউ তার ধারে কাছেও আসতে পারবে না।

পূর্ণ – বুঝতে পারছি তুমি কি বলতে চাইছ। কথাটা হচ্ছে কোথায় থামব, কি পেলে সুখী হব। আসলে যা পেলে সম্পূর্ণ সুখী হওয়া যায়, সেটা কিছুতেই তো একটা জিনিশে সীমাবদ্ধ থাকে না। এই যে আমি সামার ভ্যাকেশনে দিল্লী এলাম। এই আমিই আবার একই সঙ্গে তো দার্জিলিঙের ম্যালে গিয়ে বসে থাকতে পারি না। আমাকেই ভাবতে হয়েছে যে আমি দার্জিলিং যাব না, দিল্লিতে আসব। আর একবার এসে পড়েছি, তখন হঠাৎ দৌড়ে দার্জিলিং তো চলে যেতে পারব না। উই হ্যাভ টু মেক আ চয়েস অ্যান্ড স্টিক টু ইট।

অমলা – আমি কি সেটা জানি না? আমাকে কি তোমার ফ্রিভোলাস মনে হয় পূর্ণ? যদি ফ্রিভোলাস হতাম, ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে, আগে পিছে না ভেবে ঝাঁপ দিতাম তাহলে হয়তো তোমাকেই বিয়ে করতাম পূর্ণ, চঞ্চলকে নয়।

পূর্ণ – কি বলছ অমলা?

অমলা – আরে বাবা, আঁতকে ওঠার কিছু নেই। তোমার সঙ্গে কত সময় কাটিয়েছি সেটা ভাল লাগত বলেই তো।

পূর্ণ – কিন্তু চঞ্চলকে?

অমলা – আমাকে খুব ক্যালকুলেটিভ মনে হচ্ছে? তা কিন্তু নয়। চঞ্চলকে আমি ভালবেসেই বিয়ে করেছি। এমন নয় যে তোমাকে ভালবাসতাম আর বিয়ে করেছি চঞ্চলকে। না। তুমি কখনই এমন ছিলে না যে কোন মেয়ে বুঝতেও পারবে যে তোমাকে ভালবাসা যায়।

পূর্ণ – একদম ঠিক। সেই জন্যই আমি – (আনমনা হয়ে যায়)

অমলা – মনের মধ্যে তো এরকম দশ রকমের ভাবনা আসেই।

পূর্ণ – (গেয়ে ওঠে) চরণ ধরিতে দিওগো আমারে (দু কলি গাওয়ার পর ফোনে রিং হয়)

অমলা – থামবে না, ফোন ধরার কোন দরকার নেই এষন।

পূর্ণ – না, হয়তো চঞ্চলের ফোন।

অমলা – থাক এখন। বরং ওই গানটা গাও তো।

পূর্ণ – আমি চঞ্চলকে কথা দিয়েছি যে। যাহ্, বলে ফেললাম।

অমলা – কিসের কথা।

পূর্ণ – না, বলেছিলাম তোমার সঙ্গে গাইতে বসব না।

অমলা – ও হরি, সেই জন্যেই এত বাহানা? চঞ্চলটাকেও দেখো, এত বয়স হয়েছে এখনো কলেজ জীবনের মতই রয়ে গেল।

পূর্ণ – কেন তখনো আমার সঙ্গে গান গাইতে বারণ করত?

অমলা – এখন আর বলতে বাধা নেই, সবসময় । যা জেলু ছিল ।

পূর্ণ – তা বলতেই পারে । তুমি প্রেম করতে ওর সঙ্গে, এদিকে আমার সঙ্গে গলায় গলা জড়াচ্ছ । রাগ তো হবেই ।

অমলা – ছাড়ো তো । তখন যা বলেছে শুনিনি, আর এই বয়েসে এসে – পূর্ণ, তুমি ওই গানটা গাও না প্লীজ ।

পূর্ণ – কোনটা?

অমলা – আমার মায়ের সবচেয়ে ফেভারিট – ওই যে, দেখেছো পেটে আসছে মুখে আসছে না । চঞ্চলের সঙ্গে থেকে থেকে আমার কি অবস্থা হয়েছে?

পূর্ণ – বুঝেছি যাবার বেলায় রাঙ্গিয়ে দিয়ে যাও ?

অমলা – হ্যাঁ, হ্যাঁ ওইটা ।

(পূর্ণ গাইতে শুরু করে, অমলাও যোগ দেয় । গান শেষ হলে একটু স্তব্ধতা)

অমলা – মনে আছে পূর্ণ, একবার আমি আর তুমি শান্তিনিকেতনে যাবো ঠিক করলাম । ট্রেনে উঠব দাঁড়িয়ে আছি আমরা, দেখি চঞ্চল হাঁফাতে হাঁফাতে ব্যাগ কাঁধে হাজির, ও যাবে ।

পূর্ণ – হ্যাঁ, মনে নেই আবার? সেই যাত্রায় শান্তিনিকেতনে গিয়েও প্রাণ খুলে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দেয় নি ব্যাটা ।

অমলা – শুধু তাই? শুধুই তাই?

পূর্ণ – মানে?

অমলা – আচ্ছা তুমি এমন বিবেকানন্দ সেজে থাকো কেন? আমি তো দেখতে কিছু খারাপ ছিলাম না । ছিলাম?

পূর্ণ – তাই বলেছি নাকি? এখনো নেই ।

অমলা – তাহলে? আমার সঙ্গে একা একা যাচ্ছিলে বেশ দুদিনের জন্য ঘুরতে, চঞ্চল এসে পৌছে গেল তোমার খারাপ লাগে নি?

পূর্ণ – ওকে তো প্রথম থেকেই যেতে বলা হয়েছিল, যেতে চাইছিল না ।

অমলা – কিন্তু আমাকে বারণ করছিল । আমি শুনবো কেন? ওটা ছিল মার প্রিয় জায়গা । মা মারা যাবার পরে আর যাওয়া হয় নি । দেখো তখন আমাকে তোমার সঙ্গে দুদিনের জন্য ছাড়তে ভরসা পায়নি । আর এখন তুমি আসলে, কিরকম গটগট করে চলে গেল ।

পূর্ণ – ছাড়ো সেসব, আমি তোমাকে মাসীমার আর একটা প্রিয় গান শোনাই । (পূর্ণ গান শুরু করে – 'ভালবেসে সখী –' । এক লাইনের পর অমলা উঠে আসে, পূর্ণর পাশে এসে বসে । ধীরে ধীরে মাথাটা পূর্ণর কাঁধে রাখে)

অমলা – মনে হচ্ছে কতদিন বাদে আবার মার কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছি ।

(পূর্ণ অমলার দিকে তাকিয়ে হেসে আবার গাইতে শুরু করে । ধীরে ধীরে আলো কমে আসে । মঞ্চের অন্য প্রান্ত আলোকিত হয়, চঞ্চল বসে আছে)

চঞ্চল – আমি জানতাম পূর্ণ পারবে। তিন দিন বাদে বাড়ি ফিরে দেখলাম অমলা back to normal, everything went by the script। পূর্ণকে দুদিন কাছ থেকে দেখে আমার সাকসেস ইন লাইফ নিয়ে অমলার আর কোন সন্দেহই থাকবে না আমি জানতাম। শুধু ওই গান নিয়েই যা একটু টেনশন ছিল। কিন্তু পূর্ণ কথা রেখেছিল।

পূর্ণ – কিছুদিন ধরেই একটা দম আটাকান ব্যাপার লাগছিল, জীবনটা যেন বোঝা হয়ে উঠছিল ক্রমশ। কিন্তু সেবার দিল্লী গিয়ে অমলার সঙ্গে সেদিন – বুকের মধ্যে যেন একমুঠো ভাল লাগা ছড়িয়ে দিয়ে গেল কেউ।

অমলা – পূর্ণর বাউন্ডুলেপনায় আমার বরাবর রাগ হয়। কিন্তু এবার ওর আসাটা আমাদের দৌড়ে চলা জীবনে একটা ভাল interlude ছিল। কিংবা তার চেয়েও বেশী, যেন বাঁক ঘোরানো।

চঞ্চল – আমার জীবনে নতুন বাঁক। ঠিক যেমনটা অমলা চেয়েছিল। আমাকে All India VP Sales করে দিল। একটা নরম recognition. In fact কাজের চাপটাও খুব বেড়ে গেছে। ডেন্টিস্টের অ্যাপ্যেন্টমেন্টটাও নেওয়া হয় না অনেকদিন। কিন্তু আর যাই হোক, অমলার সঙ্গে আমার রিলেশনশিপটা এখন smooth, thanks to Purna. Life is good.

অমলা – আর কার সঙ্গে ঝগড়া করব? বাড়িতে থাকলে তো? সব সময় বাইরে বাইরে ঘুরছে। Vice President হয়েছে না সাপের পাঁচ পা দেখেছে। বাড়িতে একদম মন নেই। বোঝে না একা বাড়িতে আমার দিনের পরদিন আমার দম আটকে আসে। এত inconsiderate!

পূর্ণ – সব দিকটা কখনো নিটোল হয় না। আমিও সেটা মেনে নিয়েছি। আমার খোলা আকাশ আছে। সেই আকাশে অবকাশও আছে। শূন্যতাও আছে। সেটা নিয়ে আফসোস করে কি হবে? যা জমি তাতেই ফুল ফোটাতে হবে। ফুলের কথায় বলি আমার বাগান করার শখ হয়েছে খুব আজকাল। ভাড়া বাড়িতে থাকি, কিন্তু সামনের এক পলতা জমিতে মরশুমি ফুলের চারা বসিয়েছিলাম, একেবারে ফুলে ফুলে ভরে গেছে। এদিকে অমলা বার বার করে যেতে বলছে, আমার নাকি একবার আসা খুব দরকার। কোনদিন তো পিছুটান ছিল না। কিন্তু এই ফুল গাছগুলো? আমি না থাকলে কে যত্ন করবে? (ধীরে ধীরে পর্দা নেবে আসে)

বিশ্বদীপ চক্রবর্তী – পেশায় ইঞ্জিনীয়ার, নেশায় লেখক। প্রধানত গল্পকার, ইদানীং নাটকও লিখছেন। গল্প প্রকাশিত হয়েছে দেশ, বর্তমান, সানন্দা, কথা সোপান, দুকুল এবং আরও পত্রপত্রিকায়, এবার বাতায়নে। মঞ্চসফল নাটক 'রণাঙ্গন' – এই বছরে বেশ কয়েকবার মঞ্চে এসেছে। ধারাবাহিক উপন্যাস 'হাগা সাহেবের ট্রেন' প্রকাশ পাচ্ছে 'অন্যদেশ' ওয়েবজিনে। থাকেন অ্যান আরবার, মিশিগানে।

বইপাড়া

এই বিভাগে পাঠকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে নতুন নতুন বইয়ের। পাঠকরাই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? আপনারও কোনো বই পড়ে ভালো লাগলে, সেটির সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পরিচিতি লিখে পাঠান বাতায়নের ই-মেল ঠিকানায়, mailtomanas2014@gmail.com

পরিচয় - ১

যযাতির ঝুলি – স্বর্ভানু সান্যাল

প্রকাশক – পত্রভারতী।

মানুষ তার জন্মলগ্ন থেকেই কাহিনীপিয়াসী। গল্পের খোঁজে তার নিরন্তর যাত্রা। এই কাহিনীক্ষুধা চরিতার্থ করতে কোন আদিম কাল থেকে মানুষ ঝুলি খুলে বসেছে ঠাকুমা-ঠাকুরদারা। বাগডুম গল্প বলেছে টেনিদা-ঘনাদা। গেছে তাঁদের ঘিরে অবশ্যাম্ভাবীভাবে গরু কখনো গাছে উঠেছে তো কখনো মাকড়সা মানুষ। গল্পের মধ্যেই হয়েছে, ভালবাসার নকশিকাঁথা বোনা হয়েছে কতজনা। গল্পের মধ্যেই প্রেম হয়েছে, বিরহ হয়েছে। এইরকমই কিছু জীবনকথা নিয়ে লেখা বই "যযাতির চাখতে যাতে জিভে চড়া না পড়ে যায়, স্বাদের। কষনো অম্লমধুর দাম্পত্যকলহ কড়চা, কখনো দাদু নাতির সম্পর্কের ঈর্ষান্বিত প্রেমিকার প্রতিশোধ, কখনো শব্দতুলিতে ছবি এঁকেছে। গল্পের বানিয়ে বানিয়ে অতিরঞ্জিত আগডুম ফেলুদা বা ব্যোমকেশ যেখানেই পাকিয়ে উঠেছে রহস্যগল্প। গল্পের মেঘমুলুকে উড়েছে বাদুড় মানুষ কি সম্পর্কের রসে সম্পর্ক জারিত হয়েছে, হিংসার অনলে বহ্নিপতঙ্গ হয়েছে, বিচ্ছেদ হয়েছে, পূর্বরাগ আপাদমস্তক ছাপোষা বাঙালির ঝুলি"। এক ডজন গপ্পো। চাখতে তাই প্রতিটা গল্প লক্ষণীয়ভাবে ভিন্ন তো কখনো কর্কশ, উষর দিনের পায়রাগরম উত্তাপ তো কখনো অদ্ভুতুড়ে লোমখাড়া-করা ভয়ের গপ্পো তো কখনো কল্পবিজ্ঞান। কুশীলবেরা কখনো ছাপোষা অনিমেষ তো কখনো পকেটমার গোপাল, কখনো শর্মিষ্ঠা তো কখনো দেবযানী, কখনো রবীন্দ্রনাথ তো কখনো প্রফেসর শঙ্কু, কখনো অমানুষ তো কখনো না-মানুষ। মোটের ওপর তারা আদ্যন্ত বাঙালি। তারা বিভিন্ন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে বাঙালির রোজনামচাই বলতে চেয়েছে। শ্বাশুড়ি বৌমার তরজা নেই, অনর্থক সুড়সুড়ি নেই, নঙর্থক জীবনভাষ্য নেই। আছে এক ডজন খাস্তা তাজা মুচমুচে গপ্পো। যাকে ইংরেজিতে বলে life as it is, যযাতির ঝুলির গল্পগুলো হল গিয়ে তাই। কোনো গল্পে হয়তো মোড়কে ছাড়াতে ছাড়াতে পেয়ে যাবেন অন্য গল্পের খোঁজ। বহিরঙ্গের অর্থের আড়ালে অন্তরঙ্গ অর্থ দাঁড়িয়ে থাকবে আপনার অর্থলোলুপ মনের আশ্রয় পাওয়ার জন্য।

লেখক স্বর্ভানু সান্যাল, "যযাতির ঝুলি" নামে এক ভীষণ জনপ্রিয় ব্লগের জনক। বহু বছর ধরে মার্কিন মুলুকে প্রবাসী হলেও বাংলার মানুষগুলোই তাঁর কাহিনীর উপজীব্য। আর ঝুলিটা যযাতির কেন? যযাতি তো অত্যন্ত লম্পট, চরিত্রহীন, রিগ্রেসিভ, আদ্যন্ত বুর্জোয়া, ফিউডাল মানসিকতার মানে যাকে বলে এক্কেরে... দাঁড়ান দাঁড়ান, রসুন। ঝুলিটা যযাতির কেন জানতে হলে বইয়ের ভূমিকাটা পড়ে নেবেন। যযাতি বুড়োর কলমেই তাকে চিনে নিন।

বাতায়ন
“৫এ পা”

কোলকাতা - ৭০০ ০২৫

বাতায়ন

বাতায়ন
"৫এ পা"

BONGO SANSKRITI AUSTRALIA, CANBERRA